ত্বা-হা

২০

নাযিলের সময়-কাল

সূরা মার্‌য়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটি তার কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়। সম্ভবত হাবশায় হিজরতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটি নাযিল হয়। তবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যে এটি নাযিল হয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসটি হচ্ছে ঃ যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে বের হলেন তখন পথে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও, তোমার নিজের বোন ও ভগিনীপতি এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে। একথা শুনে হযরত উমর সোজা নিজের বোনের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে খাত্তাব ও ভগিনীপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বসেছিলেন। তাঁরা হযরত খাব্বাব ইবনে আর্‌ত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুরআনের কোনো একটি অংশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছিলেন। হযরত উমরের আসার সাথে সাথেই তার ভগিনী ঐ অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত উমর তা পড়ার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর ভগিনীপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মারতে শুরু করলেন। বোন তাঁকে বাঁচাতে চাইলেন। ফলে তাঁকেও মারলেন। এমনকি তার মাথা ফেটে গেলো। শেষে বোন ও ভগিনীপতি দুজনই বললেন, হাঁ আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, তুমি যা করতে পারো করো। নিজের বোনের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর কিছুটা লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। বোন প্রথমে তা ছিঁড়ে না ফেলার জন্য শপথ নিলেন তারপর বললেন, তুমি গোসল না করা পর্যন্ত এ পবিত্র সহীফায় হাত লাগাতে পারবে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করলেন তারপর সে সহীফা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সেখানে এ সূরা ত্বা-হা লেখা ছিল। পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়লো, "বড় চমৎকার কথা।" একথা শুনতেই হযরত খাব্বাব ইবনে আর্‌ত বের হয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি হযরত উমরের আগমনের শব্দ শুনেই লুকিয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর নবীর দাওয়াত ছড়াবার ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যে বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। গতকালই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ ! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জেহেল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব, এ দু' জনের মধ্য থেকে কোনো একজনকে ইসলামের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। কাজেই হে উমর ! আল্লাহর দিকে চলো, আল্লাহর দিকে চলো।" ওমরের মনে পরিবর্তন ঘটতে যেটুকু বাকি ছিল খাব্বাবের এ উক্তি তাও পূর্ণ করে দিল। তখনই হযরত

উমর খাত্তাবের সাথে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এটি হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরের ঘটনা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরাটি এভাবে শুরু হয়েছে, হে মুহাম্মাদ! অযথা তোমাকে একটি বিপদের সম্মুখীন করার জন্য তোমার ওপর এ কুরআন নাযিল হয়নি। তোমার কাছে এ দাবী করা হয়নি যে, পাথরের বুক চিরে দুধের নহর বের করে আনো, অস্বীকারকারীদেরকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ো এবং হঠকারীদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেখিয়ে দাও। এটি তো শুধুমাত্র একটি উপদেশ ও স্মারক, যার ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগবে এবং তাঁর পাকড়াও থেকে যে নিষ্কৃতি পেতে চায় সে এটি শুনে সংশোধিত হয়ে যাবে। এটি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের কালাম এবং তিনি ছাড়া আর কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। কেউ মানুক না মানুক এ দু'টি কথা চিরন্তন ও অমোঘ সত্য।

এ ভূমিকার পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু করা হয়েছে। বাহ্যত একটি কাহিনী আকারে এটি বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন অবস্থার প্রতি কোনো ইংগিতও এতে নেই। কিন্তু যে পরিবেশে এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার অবস্থার সাথে মিলেমিশে এটি মক্কাবাসীদের সাথে কিছু ভিন্নতর কথা বলছে বলে মনে হয়। এর শব্দ ও বাক্যগুলো থেকে নয় বরং দুই বাক্যের মধ্যস্থিত অনুচ্চারিত ভাবার্থ থেকেই সে কথা প্রকাশিত হচ্ছে। সে কথা প্রকাশের আগে আর একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, আরব দেশে বিপুল সংখ্যক ইহুদীদের উপস্থিতি এবং আরববাসীদের ওপর ইহুদীদের জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে, তাছাড়া রোমের ও হাবশার খৃস্টীয় শাসনের প্রভাবেও আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করা হতো। এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার পর এখন আসুন এ কাহিনীর মধ্যে যে অব্যক্ত কথাগুলো মক্কাবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করি ঃ

এক ঃ কাউকে নবুওয়াত দান করার জন্য আল্লাহ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে একত্র করে যথারীতি একটি উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণাবাণী শুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি যে, আজ থেকে অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাদের জন্য নবী নিযুক্ত করেছি। নবুওয়াত যাকেই দেয়া হয়েছে হযরত মূসার মতো গোপনীয়তা রক্ষা করেই দেয়া হয়েছে। কাজেই আজ তোমরা অবাক হচ্ছো কেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকস্মাত তোমাদের সামনে নবী হিসেবে হাযির হয়ে গেছেন, আকাশ থেকেও এর ঘোষণাবাণী উচ্চারিত হলো না। আর ফেরেশতারাও পৃথিবীতে এসে ঢাকঢোল পিটিয়ে একথা ঘোষণা করলেন না ? ইতিপূর্বে যাদেরকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের নিযুক্তিকালে কবে এ ধরনের ঘোষণা হয়েছিল যে, আজ তা হবে ?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ যে কথা পেশ করছেন (অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত) ঠিক একই কথা নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করার সময় আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছিলেন।

তিন ঃ তারপর আজ যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রকার সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য সামন্ত ছাড়াই কুরাইশদের মুকাবিলায় সত্যের দাওয়াতের পতাকাবাহী করে একাকী দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মূসা আলাইহিস সালামকেও ফেরাউনের মতো মহাপরাক্রমশালী বাদশাহকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করার আহ্বান জানাবার গুরুদায়িত্বে আকস্মিকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর সাথেও কোনো সেনাবাহিনী পাঠানো হয়নি। আল্লাহর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। তিনি মাদ্য়ান থেকে মিসর গমনকারী একজন পথিককে পথ চলাকালে ধরে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং বলেন, যাও, সমকালের সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও জালেম শাসকের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও। কিছু সাহায্য করে থাকলে এতটুকু করেছেন যে, তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাইকে সাহায্যকারী হিসেবে দিয়েছেন। কোনো দুর্দান্ত সেনাবাহিনী এবং হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে এ কঠিন কাজে তাঁকে সাহায্য করা হয়নি।

চার ঃ মক্কাবাসীরা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, সংশয়-সন্দেহ, অপবাদ-দোষারোপ, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করছে ফেরাউন এসব অস্ত্র আরো অনেক বেশী করে মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দেখো কিভাবে তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ী হলো ? আল্লাহর সেই সাজসরঞ্জামহীন নবী, না সৈন্য বলে বলীয়ান ফেরাউন ? এ প্রসংগে মুসলমানদেরকেও একটি অব্যক্ত সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের দৈন্য ও কাফেরদের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ করো না, বরং যে কাজের পেছনে আল্লাহর হাত থাকে শেষ পর্যন্ত তারই বিজয় সূচিত হয়। এ সংগে মুসলমানদের সামনে মিসরের যাদুকরদের দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। যখন সত্য তাদের কাছে আবরণমুক্ত হয়ে গেলো তখন তারা নির্দ্বিধায় তার প্রতি ঈমান আনলো। তারপর ফেরাউনের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে এক চুল পরিমাণও সরিয়ে আনতে পারলো না।

পাঁচ ঃ শেষে বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে একটি সাক্ষ পেশ করতে গিয়ে দেবতা ও উপাস্য তৈরির সূচনা কেমন হাস্যকর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী কখনো এ ধরনের ঘৃণ্য জিনিসের নামগন্ধও বাকি রাখার পক্ষপাতি হন না। কাজেই আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিরক ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করছেন তা নবুওয়াতের ইতিহাসের কোনো নতুন ঘটনা নয়।

এভাবে মূসার কাহিনীর মোড়কে এমন সমস্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যা সে সময় তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘাতের সাথে সম্পর্ক রাখতো। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ এ কুরআন একটি উপদেশ ও স্মারক। তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদের বুঝাবার জন্য এটি পাঠানো হয়েছে। এর বক্তব্য শুনলে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর এর কথা না মানলে তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

তারপর আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো এটা হচ্ছে শয়তানের পদাংক অনুসরণ। কখনো সখনো শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া অবশ্যি একটি সাময়িক দুর্বলতা। মানুষের পক্ষে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মানুষের জন্য সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যখনই তার সামনে তার ভুল সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে তখনই সে তার পিতা আদমের মতো পরিষ্কার ভাষায় তা স্বীকার করে নেবে, তাওবা করবে এবং আবার আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসবে। ভুল করা ও তার ওপর অবিচল থাকা এবং একের পর এক উপদেশ দেবার পরও তা থেকে বিরত না হওয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। এর পরিণাম নিজেকে ভূগতে হবে, অন্যের এতে কোনো ক্ষতি নেই।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝানো হয়েছে যে, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বে-সবর হবেন না। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো জাতিকে তার কুফরী ও অস্বীকারের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না বরং তাকে সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কাজেই ভীত হবেন না। ধৈর্য সহকারে এদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম অত্যাচার বরদাশত করতে এবং উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে থাকুন।

প্রসংগক্রমে নামাযের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে সবর, সংযম, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি এবং আত্মপর্যালোচনার এমন গুণাবলী সৃষ্টি হয় যা সত্যের দাওয়াত দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন।

❒

আয়াত ১৩৫ | সূরা ত্বা–হা–মক্কী | রুকূ' ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰهٰ ۝ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝

ত্বা–হা। আমি এ কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে। এ তো একটি স্মারক এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে।[১] যে সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশজগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এটি নাযিল করা হয়েছে। তিনি পরম দয়াবান। (বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।[২] যাকিছু পৃথিবীতে ও আকাশে আছে, যাকিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে আছে এবং যাকিছু ভূগর্ভে আছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চেয়েও গোপনে বলা কথাও জানেন।[৩] তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।[৪]

১. এ বাক্যটি নিজেই পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থের ওপর আলোকপাত করছে। উভয় বাক্য মিলিয়ে পড়লে এ পরিষ্কার অর্থটি বুঝা যায় যে, কুরআন নাযিল করে আমি তোমার দ্বারা এমন কোনো কাজ করাতে চাই না যা তোমার পক্ষে করা অসম্ভব। তোমাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি যে, যারা মেনে নিতে চায় না তাদেরকে মানাতেই হবে এবং যাদের অন্তরের দুয়ার ঈমানের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করাতেই হবে। এটা তো একটা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং এটা এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে এটা শুনে সজাগ হবে। এখন যদি কিছু লোকের মনে আল্লাহর ভয় একদম না থেকে থাকে এবং তাদের হক ও বাতিলের

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾ إِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْٓا إِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾ إِنِّيْٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾ إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾

আর তোমার কাছে কি মূসার খবর কিছু পৌঁছেছে ? যখন সে একটি আগুন দেখলো[৫] এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকে বললো, "একটু দাঁড়াও, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো তোমাদের জন্য এক আধটি অংগার আনতে পারবো অথবা এ আগুনের নিকট আমি কোনো পথের দিশা পাবো।"[৬]

সেখানে পৌঁছলে তাকে ডেকে বলা হলো, "হে মূসা! আমিই তোমার রব, জুতো খুলে ফেলো,[৭] তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছো[৮] এবং আমি তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি, শোনো যাকিছু অহী করা হয়। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তুমি আমার ইবাদাত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো।[৯] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি প্রাণসত্তা তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে।[১০]

কোনো পরোয়াই না থাকে তাহলে তাদের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই তোমার নেই।

২. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পর তিনি কোথাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েননি। বরং সৃষ্টিজগতে সমস্ত ব্যবস্থা নিজেই পরিচালনা করছেন। এই সীমাহীন রাজ্যে তিনি নিজেই রাজত্ব করছেন। তিনি কেবল স্রষ্টাই নন, কার্যত শাসকও।

৩. অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের ওপর যেসব জুলুম নিপিড়ন চলছে এবং যেসব দুষ্কৃতি ও শয়তানী কার্যকলাপের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলোর জন্য তোমার উচ্চ কণ্ঠে ফরিয়াদ জানানোর তেমন কোনো দরকার নেই। তুমি কোন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছো তা আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। তিনি তোমাদের অন্তরের ডাকও শুনছেন।

৪. অর্থাৎ তিনি সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী।

৫. এটা সে সময়ের কথা যখন হযরত মূসা মাদইয়ানে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যার সাথে মাদইয়ানে বিয়ে হয়েছিল) নিয়ে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন। এর আগের ঘটনা সূরা কাসাসে বর্ণিত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হযরত মূসার হাতে একজন মিসরীয় মারা পড়ার ফলে তিনি নিজের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। এ সময় তিনি মিসর ত্যাগ করে মাদয়ানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৬. মনে হচ্ছে তখন সময়টা ছিল শীতকালের একটি রাত। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে একটি আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা কমপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন আর পেয়ে গেলেন সেখানে আখেরাতের পথ।

৭. সম্ভবত এ ঘটনার কারণে ইহুদীরা তাদের শরীয়াতের এ বিধান তৈরি করে নিয়েছে যে, জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়া জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিভ্রান্তিটি দূর করার জন্য বলেন ঃ

خالفوا اليهود فانهم لايصلون فى نعالهم ولا خفافهم

"ইহুদীদের বিপরীত কাজ করো। কারণ তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরে নামায পড়ে না।" (আবু দাউদ)

এর অর্থ এ নয় যে, জুতা পরেই নামায পড়তে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এমনটি করা জায়েয। কাজেই উভয়বিধ কাজ করো। আবু দাউদে আমর ইবনে আসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছেন। মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী (স) বলেছেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে, সে যেন তার জুতা পরীক্ষা করে দেখে নেয়। যদি কোনো নাপাকী লেগে থাকে। তাহলে মাটিতে ঘসে পরিষ্কার করো এবং সে জুতা পরে নামায পড়ে নাও।" আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাগুলো আছে ঃ "যদি তোমাদের কেউ জুতা দিয়ে নাপাকী মাড়িয়ে থাকে তাহলে মাটি তাকে পাক করে দেবার জন্য যথেষ্ট।" আর হযরত উম্মে সালমাহ (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে يطهره ما بعده অর্থাৎ "এক জায়গায় নাপাকী লেগে থাকলে অন্য জায়গায় যেতে যেতে মাটি নিজেই তাকে পাক করে দেবে।" এ বিপুল সংখ্যক হাদীসের কারণে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আওযায়ী ও ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়াহ প্রমুখ ফকীহগণ এমত পোষণ করেন যে, জুতা সর্বাবস্থায় যমীনের মাটির সাহায্যে পাক হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর একটি উক্তিও এর সমর্থনে রয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফেঈর সর্বজন পরিচিত উক্তি এর বিরোধী। সম্ভবত তিনি জুতা পরে নামায পড়া আদবের বিরোধী মনে করে তা করতে নিষেধ করেন। যদিও একথা মনে করা হয়েছে যে, তাঁর মতে

জুতা মাটিতে ঘসলে পাক হয় না। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মসজিদে নববীতে চাটাইয়ের বিছানাও ছিল না বরং কাঁকর বিছানো ছিল। কাজেই এসব হাদীসের প্রমাণের ভিত্তিতে যদি কোনো ব্যক্তি আজ মসজিদের বিছানার ওপর জুতা পায়ে উঠতে চায় তাহলে তা সঠিক হবে না। তবে ঘাসের ওপর বা খোলা ময়দানে জুতা পায়ে নামায পড়তে পারে। তবে যারা মাঠে-ময়দানে জানাযার নামায পড়ার সময়ও পা থেকে জুতা খুলে ফেলার ওপর জোর দিতে থাকে তারা আসলে শরীয়াতের বিধান জানে না।)

৮. সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, "তুওয়া" ছিল এই উপত্যকাটির নাম। কিন্তু কোনো কোনো মুফাসসির "পবিত্র তুওয়া উপত্যকা" অর্থ করেছেন "এমন উপত্যকা যাকে একটি সময়ের জন্য পবিত্র করা হয়েছে।"

৯. এখানে নামাযের মূল উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ যেন আল্লাহ থেকে গাফেল না হয়ে যায়। দুনিয়ার চোখ ধাঁধানো দৃশ্যাবলী যেন তাকে এ সত্য বিমুখ না করে দেয় যে, সে কারো বান্দা এবং সে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। এ চিন্তাকে জীবন্ত ও তরতাজা রাখার এবং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে নামায। প্রতিদিন কয়েকবার মানুষকে দুনিয়ার কাজকারবার থেকে সরিয়ে নামায তাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়।

কেউ কেউ এর এ অর্থও নিয়েছেন যে, নামায কায়েম করো যাতে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ "আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণে রাখবো।"

আনুসংগিকভাবে এ আয়াত থেকে এ বিধানটিও বের হয় যে, যে ব্যক্তি ভুলে যায় তার যখনই মনে পড়বে তখনই নামায পড়ে নেয়া উচিত। হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

"কোনো ব্যক্তি কোনো সময় নামায পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই নামায পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া এর আর কোনো কাফফারা নেই। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ)

এ অর্থে হযরত আবু হুরাইরার (রা) একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি তাঁদের হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে কি করবো ? জবাবে তিনি বলেন, "ঘুমের মধ্যে কোনো দোষ নেই। দোষের সম্পর্ক তো জেগে থাকা অবস্থার সাথে। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন জেগে উঠলে বা মনে পড়লে তৎক্ষণাত নামায পড়ে নেবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

১০. তাওহীদের পরে যে দ্বিতীয় সত্যটি প্রত্যেক যুগে সকল নবীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং যার শিক্ষা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۝ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ۝ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ۝ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٭ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ۝ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ۝ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۝ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে—"আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি ?"[১১]

মূসা জবাব দিল, "এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্যে পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।"[১২]

বললেন, "একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা।"

সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাত সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল।

বললেন, "ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোনো প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে,[১৩] এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এজন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।"

আখেরাত। এখানে কেবলমাত্র এ সত্যটি বর্ণনা করাই হয়নি বরং এর উদ্দেশ্যের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রতীক্ষিত সময়টি আসার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং যে কাজ করেছে তার প্রতিদান পাবে সে আখেরাতে। তবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে সে সময়টি গোপন রাখা হয়েছে। যার আখেরাতের সামান্য চিন্তা থাকবে সে সবসময় এ সময়টির কথা ভাববে এবং এ ভাবনা

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

২ রুকূ'

মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও[১৪] আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।[১৫] আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারুনকে।[১৬] তার মাধ্যমে আমার হাত মযবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং খুব বেশী করে তোমার চর্চা করি। তুমি সবসময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক।"

তাকে ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি বৈষয়িক কাজকর্মের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইবে সে এ চিন্তার মধ্যে ডুবে যাবে যে, কিয়ামত এখনো অনেক দূরে বহুদূরে ও তার আসার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না।

১১. জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না। বরং আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এ ছিল যে, তাঁর হাতে যে লাঠি আছে অন্য কিছু নয় এ ব্যাপারে যেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যান এবং এরপর দেখেন আল্লাহর কুদরাতের খেলা কিভাবে শুরু হয়।

১২. যদিও জবাবে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ঠ ছিল যে, জনাব, এটি একটি লাঠি। কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

১৩. সূর্যের আলোর মতো আলো হবে কিন্তু এর ফলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। বাইবেলে সাদা হাতের ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের তাফসীরগুলোতেও এর প্রচলন হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা যখন বগলে হাত রেখে বাইরে বের করলেন তখন দেখা গেলো পুরো হাতটাই কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো সাদা হয়ে গেছে। তারপর আবার যখন তা বগলে রাখলেন তখন আবার আগের মতো হয়ে

গেছে। এ মুজিযাটির এ ব্যাখ্যাই তালমূদেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের কুষ্ঠরোগ ছিল এবং এ রোগ সে লুকিয়ে রেখেছিলে। তাই তার সামনে এ মুজিযা পেশ করে তাকে দেখানো হয়েছে যে, দেখো মুহূর্তের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে মুহূর্তের মধ্যেই তা নিরাময় করা যায়। কিন্তু প্রথমত ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা কোনো নবীকে কুষ্ঠরোগের মুজিযা দিয়ে এক বাদশাহর দরবারে পাঠানোর ব্যাপারটিই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত ফেরাউনের যদি অপ্রকাশ্য কুষ্ঠরোগ থেকে থাকে তাহলে কুষ্ঠরোগীর সাদা হাত শুধুমাত্র তার একার জন্য মুজিযা হতে পারে, তার সভাসদদের ওপর এ মুজিযার কী প্রভাব পড়বে ? কাজেই সঠিক কথা এটাই যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ তাঁর হাত সূর্যলোকের মতো আলোকোজ্জল হয়ে উঠতো এবং চোখ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো না। প্রথম যুগের মুফাসসিরদের অনেকেই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

১৪. অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দাও। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দাও। যেহেতু হযরত মূসা (আ)-কে একটি অনেক বড় কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করা হচ্ছিল যা করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন তাই তিনি দোয়া করেন, আমাকে এমন ধৈর্য, ধৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করো যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন।

১৫. বাইবেলে এর যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা বললেন ঃ "হায় সদাপ্রভু ! আমি বাকপটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি। কারণ আমি জড়মুখ ও জড় জিহ্বা। (যাত্রা পুস্তক ৪ ঃ ১০) কিন্তু তালমূদে এ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে একথা বলা হয়েছে যে, শৈশবে হযরত মূসা যখন ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখন একদিন তিনি ফেরাউনের মাথার মুকুট নামিয়ে নিজের মাথায় পরে নেন। এতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ শিশু এ কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে অথবা এটা তা নিছক বালকসূলভ চপলতা। শেষে ঠিক করা হয়, শিশুর সামনে সোনা ও আগুন একসাথে রাখা হবে। সে মোতাবেক দুটি জিনিস এনে একসাথে সামনে রাখা হলো এবং হযরত মূসা আগুন উঠিয়ে মুখে পুরে দিলেন। এতে তিনি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার জিহ্বায় চিরকালের জন্য জড়তা সৃষ্টি হয়।

এ কাহিনী ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আমাদের তাফসীর গ্রন্থগুলোতেও লিখিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে। শিশু যদি আগুনে হাত দিয়েও ফেলে তাহলে এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে অংগার উঠিয়ে নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দেবে। শিশু তো আগুনের জ্বালা অনুভব করার সাথে সাথেই হাত গুটিয়ে নেবে। পোড়া হাতে অংগার নিয়ে সে অংগার মুখে দেবার অবকাশ পাবে কেমন করে ? কুরআনের শব্দাবলী থেকে আমরা যে কথা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মধ্যে বাগ্মীতার অভাব দেখছিলেন। ফলে তাঁর মনে আশংকা জেগেছিল যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর কখনো বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ۝ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো। আমি আর একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম।[১৭] সে সময়ের কথা মনে করো যখন আমি তোমার মাকে ইশারা করেছিলাম, এমন ইশারা যা অহীর মাধ্যমে করা হয়, এই মর্মে যে, এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, দরিয়া তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে এবং আমার শত্রু ও এ শিশুর শত্রু একে তুলে নেবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

(এ পর্যন্ত যার কোনো প্রয়োজন তাঁর দেখা দেয়নি) তাহলে তাঁর স্বভাবসুলভ সংকোচ বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারি। এ বিষয়েই ফেরাউন একবার তাঁকে খোটা দিয়ে বলেছিল। "এ ব্যক্তি তো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না" (لَا يَكَادُ يُبِينُ যুখরুফ ৫২) এ দুর্বলতা অনুভব করেই হযরত মূসা নিজের ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে চান। সূরা কাসাসে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا

"আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাকপটু তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও" (আল কাসাস ঃ আয়াত ৩৪।) পরবর্তী আলোচনায় আরো জানা যায় যে, হযরত মূসার এ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ জোরদার ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন। কুরআনে ও বাইবেলে তাঁর পরবর্তীকালের যেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা উন্নত পর্যায়ের শাব্দিক অলংকার ও বাকপটুতার সাক্ষ দেয়।

জিভে জড়তা আছে এমন একজন তোতলা ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজের রসূল নিযুক্ত করবেন, একথা স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি বিরোধী। রসূলরা সবসময় এমন ধরনের লোক হয়েছেন যারা চেহারা, সুরত, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার দিকে হয়েছেন সর্বোত্তম, যাদের ভেতর বাইরের প্রতিটি দিক অন্তর ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। কোনো রসূলকে এমন কোনো

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ
أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ
وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ
قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِي
وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ
قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ
عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বললো, "আমি কি তোমাদের তার সন্ধান দেবো, যে এ শিশুকে ভালোভাবে লালন করবে ?" এভাবে আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। এবং (এটাও স্মরণ করো) তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, আমি তোমাকে এ ফাঁদ থেকে বের করেছি এবং তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি, আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলে। তারপর এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো। হে মূসা! আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। যাও, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ এবং দেখো আমার স্মরণে ভুল করো না। যাও, তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।"[১৮]

উভয়েই[১৮(ক)] বললো, "হে আমাদের রব! আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা আমাদের ওপর চড়াও হবে।"

দোষ সহকারে পাঠানো হয়নি এবং পাঠানো যেতে পারতো না, যে কারণে তিনি লোকদের মধ্যে হাস্যাস্পদ হন অথবা লোকেরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

১৬. বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হযরত হারুন হযরত মূসার চাইতে তিন বছরের বড় ছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৭ ঃ ৭)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি। যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে। আমাদের অহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১৯]

ফেরাউন[২০] *বললো, "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দুজনের রব কে হে মূসা ?"*[২১]

মূসা জবাব দিল, "আমাদের রব তিনি[২২] *যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথনির্দেশ দিয়েছেন।"*[২৩]

১৭. এরপর আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তাঁর প্রতি যতগুলো অনুগ্রহ করা হয়েছিল, এক এক করে তার সবকটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত মূসাকে এ অনুভূতি দান করা যে, এখন যে কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হচ্ছে এ কাজের জন্যই তোমাকে পয়দা করা হয়েছে এবং এ কাজের জন্যই আজ পর্যন্ত বিশেষ সরকারী তত্ত্বাবধানে তুমি প্রতিপালিত হয়ে এসেছো।

১৮. মানুষ দু'ভাবে সঠিক পথে আসে। সে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে-শুনে ও উপদেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা হয়ে যায়।

১৮(ক). মনে হচ্ছে এটা এমন সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আ) মিসরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন কার্যত তাঁর সাথে শরীক হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে উভয়েই আল্লাহর কাছে এ নিবেদন পেশ করে থাকবেন।

১৯. এ ঘটনাটি বাইবেল ও তালমূদে যেভাবে পেশ করা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলানো দরকার। এর ফলে কুরআন মজীদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা কেমন মর্যাদা সহকারে বর্ণনা করেছে এবং বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে এর কি চিত্র অংকন করা হয়েছে তা আন্দাজ করা যাবে। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, প্রথমবার আল্লাহ যখন মূসাকে বললেন, "এখন আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার জাতি বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে আনবে" তখন হযরত মূসা জবাব দিলেন, "ফেরাউনের কাছে যাবার এবং বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে আনার আমি কে ?" তারপর আল্লাহ হযরত মূসাকে অনেক বুঝালেন, তাঁর মনে শক্তি সঞ্চার করলেন, মু'জিযা দান করলেন কিন্তু মূসা আবার একথাই বললেন, "হে আমার প্রভু, বিনয় করি, অন্য যাহার হাতে পাঠাইতে চাও এ বার্তা পাঠাও।" (যাত্রাপুস্তক ৪ ঃ ১৩) তালমূদের বর্ণনা আবার এর চাইতে কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ ও হযরত মূসার সাথে সাতদিন পর্যন্ত বাদানুবাদ হতে থাকে। আল্লাহ বলতে থাকেন, নবী হও। কিন্তু মূসা বলতে থাকেন, আমার কণ্ঠই খুলছে না, কাজেই আমি নবী হই কেমন করে। শেষে আল্লাহ বললেন, তুমি নবী হয়ে যাও এতেই আমি খুশী। একথায় হযরত মূসা বললেন, লূতকে বাঁচাবার জন্য আপনি ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, হাজেরা যখন সারার গৃহ থেকে বের হলেন তখন তার জন্য পাঁচজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, আর এখন নিজের বিশেষ সন্তান (বনী ইসরাঈল)-দেরকে মিসর থেকে বের করে আনার জন্য আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন ? একথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি রিসালাতের কাজে তাঁর সাথে হারুনকে শরীক করে দিলেন। আর মূসার সন্তানদের বঞ্চিত করে পৌরহিত্যের দায়িত্ব হারুনের সন্তানদের দিয়ে দিলেন—এগুলোই হচ্ছে প্রাচীন কিতাব এবং নির্লজ্জ লোকেরা এগুলো সম্পর্কে বলে থাকে যে, কুরআনের এ কাহিনীগুলো নাকি এসব কিতাব থেকে নকল করা হয়েছে।

২০. হযরত মূসা কিভাবে ফেরাউনের কাছে পৌছলেন এবং কিভাবে তার সামনে নিজের দাওয়াত পেশ করলেন এসব বিস্তারিত বিবরণ এখানে পরিহার করা হয়েছে। সূরা আরাফের ১৩ রুকূতে এ আলোচনা এসেছে। আর সামনের দিকে সূরা শূআরার ২-৩, সূরা কাসাসের ১৪ এবং সূরা নাযিআতের ১ রুকূতে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরাউন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফের ৮৫ টীকা দেখুন।

২১. দুই ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু মূল নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ) এবং দাওয়াতদানের তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তাই ফেরাউন তাঁকে সম্বোধন করে। আর হতে পারে তাঁকে সম্বোধন করার তার আর একটি কারণও থাকতে পারে। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, সে হযরত হারুনের বাকপটুতা ও উন্নত বাগ্মীতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে হযরত মূসার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। ইতিপূর্বে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরাউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দুজন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিসর ও মিসরবাসীদের রব তো আমিই। সূরা নাযিআতে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে

যে, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى হে মিসরবাসীরা! আমি তোমাদের প্রধানতম রব। সূরা যুখরুফে সে দরবারের সমস্ত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলে ঃ

يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيْ

"হে আমার জাতি ! মিসরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই ? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না ?" (৫১ আয়াত) সূরা কাসাসে সে নিজের সভাসদদের সামনে এভাবে হুংকার দিয়ে বলে ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ج فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى.

"হে জাতির সরদারগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে একবার দেখি তো এই মূসা কাকে ইলাহ বানাচ্ছে।" (৩৮ আয়াত)

সূরা শূ'আরায় সে হযরত মূসাকে ধমক দিয়ে বলে ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

"যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ বানিয়েছো তাহলে মনে রেখো, তোমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেবো।" (২৯ আয়াত)

এর অর্থ এ নয় যে, ফেরাউন তার জাতির একমাত্র মাবুদ ছিল এবং সেখানে তার ছাড়া আর কারো পূজা হতো না। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ফেরাউন নিজেকে সূর্য দেবতার (র' বা রা') অবতার হিসেবে বাদশাহের দাবীদার বলতো। তাছাড়া মিসরের ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, বহু দেবী ও দেবতার পূজা-উপাসনা করা ছিল এ জাতির ধর্ম। তাই "একমাত্র পূজনীয়" হওয়ার দাবী ফেরাউনের ছিল না। বরং সে কার্যত মিসরের এবং আদর্শগতভাবে সমগ্র মানব জাতির রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার ছিল। সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোনো সত্তা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। তার আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণে কোনো কোনো লোকের ধারণা হয়েছে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ্ ও উপাস্য হওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু একথা কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, সে উর্ধ জগতে অন্য কারো শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করতো। সূরা আল মু'মিন ২৮-৩৪ এবং সূরা যুখরুফ ৫৩ আয়াত গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন। এ আয়াতগুলো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতো না। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোনো রসূল এসে তার ওপর হুকুম চালাবে, এটা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাসাস, ৫৩ টীকা)

২২. অর্থাৎ আমরা সকল অর্থে একমাত্র তাঁকেই রব মানি। প্রতিপালক, প্রভু, মালিক, শাসক ইত্যাকার সকল অর্থেই আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও রব বলে স্বীকার করি না।

২৩. অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাকে দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার তা তাকে দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্ব-জাহানে তার নিজের অংশের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শুনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার ও পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নিদের্শ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি সারা বিশ্ব-জাহান এবং তার সমস্ত জিনিসের শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তাদের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকও।

এ অতুলনীয় ব্যাপক অর্থবহুল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু একথাই বলেননি যে, তাঁর রব কে ? বরং একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি রব কেন এবং কেন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে রব বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না। দাবীর সাথে সাথে তার যুক্তি-প্রমাণও এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে এসে গেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, যখন ফেরাউন ও তার প্রত্যেকটি প্রজা তার নিজের বিশেষ অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অনুগৃহীত এবং যখন তাদের এক জনেরও শ্বাসযন্ত্র পাকস্থলী ও হৃদযন্ত্র আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নিজের কাজ করে না যাওয়া পর্যন্ত সে এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না তখন ফেরাউনের নিজেকে লোকদের রব বলে দাবী করা এবং লোকদের কার্যত তাকে নিজেদের রব বলে মেনে নেয়া একটা নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আবার এ ছোট্ট বাক্যে হযরত মূসা (আ) ইশারায় রিসালাতের যুক্তিও পেশ করে দিয়েছেন। ফেরাউন এই রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। হযরত মূসার যুক্তির মধ্যে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের পথনির্দেশক এবং যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর পথ নির্দেশনা দেবার বিশ্বজনীন দায়িত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের জন্যও পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর মাছ ও মুরগীর জন্য যে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী, মানুষের সচেতন জীবনের জন্য সে ধরনের পথ নির্দেশনা উপযোগী হতে পারে না। এর সবচেয়ে মানানসই পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষদের পথ দেখাবার জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তিনি মানুষদের বুদ্ধি ও চেতনার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সঠিক-সোজা পথ দেখাবেন।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ۗ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

ফেরাউন বললো, "আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল ?"[২৪]

মূসা বললো, "সে জ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না।"[২৫]

—তিনিই[২৬] *তোমাদের জন্য যমীনের বিছানা বিছিয়েছেন, তার মধ্যে তোমাদের চলার পথ তৈরি করেছেন এবং ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। খাও এবং তোমাদের পশুও চরাও। অবশ্যি এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য বহু নিদর্শনাবলী।*[২৭]

২৪. অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে দুনিয়ায় কাজ করার পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রব নেই, তাহলে এ আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভু ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে ? তারা সবাই কি গোমরাহ ছিল ? তারা সবাই কি আযাবের হকদার ছিল ? তাদের সবার কি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল ? এ ছিল ফেরাউনের কাছে হযরত মূসার এ যুক্তির জবাব। হতে পারে সে মূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এ জবাব দিয়েছে। আবার দুষ্টামীর কারণেও এ জবাব দিতে পারে। তাছাড়া এ উভয় কারণই এ জবাবের পিছনে সক্রিয় থাকতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেও একথায় রাগান্বিত হয়েছে যে, এ ধর্মের কারণে আমাদের সকল বুযর্গ যে পথভ্রষ্ট ছিল তা মেনে নিতে হবে আবার সাথে সাথে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিসরবাসীদের মনে হযরত মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। সত্যপন্থীদের সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রটি হামেশা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূর্খদের কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এটা বড়ই প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যে সময় কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় সে সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশী এ অস্ত্রটিকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের এ ছলনার উল্লেখ যথার্থই ছিল।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৩ রুকূ'

এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এ থেকেই আবার তোমাদেরকে বের করবো।[২৮]

২৫. এটি হযরত মূসার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব। এ থেকে প্রচার কৌশল সম্পর্কে ভালো শিক্ষা লাভ করা যায়। উপরের বর্ণনা অনুসারে ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো। যদি হযরত মূসা বলতেন, হ্যাঁ, তারা সবাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তাহলে এটা সত্য কথনের বিরাট আদর্শ হলেও এ জবাব হযরত মূসার পরিবর্তে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। তাই তিনি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে এমন জবাব দেন যা ছিল একদিকে যথার্থ সত্য এবং অন্যদিকে ফেরাউনের বিষ দাঁতও উপড়ে ফেলতে সক্ষম। তিনি বলেন, তারা যাই কিছু ছিল, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোনো উপায় নেই। কাজেই তাদের ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিই কেমন করে ? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন। কোনো জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোনো জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং তাদের পরিণাম কি হবে, তোমার ও আমার একথা চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের ভূমিকা কি এবং আমরা কোন ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হবো।

২৬. কথার ধরন থেকে বুঝা যাচ্ছে, হযরত মূসার জবাব "বিস্মৃতও হন না"-এ এসে শেষ হয়ে গেছে এবং এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত সমস্ত ভাষ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও স্মারক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতীতে ঘটেছে বা আগামীতে ঘটবে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে যখন কোনো ব্যক্তির কোনো উক্তি উদ্ধৃত করা হয় তখন তার পরপরই উপদেশ, ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে কয়েকটি অতিরিক্ত বাক্য বলা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথার ধরন থেকেই জানা যায় যে, এগুলো ইতিপূর্বে যে ব্যক্তির কথার আলোচনা চলছিল তার উক্তি নয় বরং আল্লাহর নিজের উক্তি।

উল্লেখ্য এ ভাষ্যের সম্পর্ক কেবলমাত্র নিকটবর্তী বাক্য "আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না"-এর সাথে নেই বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সমগ্র বক্তব্যের সাথে রয়েছে এর সম্পর্ক, যা رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ থেকে শুরু হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ যারা ভারসাম্যপূর্ণ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে সত্য অনুসন্ধান করতে চান তারা এ নিদর্শনাবলীর সহায়তায় প্রকৃত সত্যের মনযিলে পৌঁছার পথ জানতে পারেন। এ নিদর্শনাবলী তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের একজন রব আছেন

وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾

আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম।[২৯] কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না। বলতে লাগলো, "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, নিজের যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দেবে ?[৩০] বেশ, আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ যাদু আনছি, ঠিক করো কবে এবং কোথায় মুকাবিলা করবে, আমরাও এ চুক্তির অন্যথা করবো না, তুমিও না। খোলা ময়দানে সামনে এসে যাও।"

মূসা বললো, "উৎসবের দিন নির্ধারিত হলো এবং পূর্বাহ্নে লোকদেরকে জড়ো করা হবে।[৩১] ফেরাউন পেছনে ফিরে নিজের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো এবং তারপর মুকাবিলায় এসে গেলো।[৩২]

এবং সমগ্র রুবুবিয়াত ও এলাহী কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্য কোনো রবের জন্য এখানে কোনো অবকাশ নেই।

২৮. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। একটি পর্যায় হচ্ছে বর্তমান জগতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হবার পরের পর্যায়। এই আয়াতের দৃষ্টিতে এ তিনটি পর্যায়ই অতিক্রান্ত হবে এ যমীনের ওপর।

২৯. অর্থাৎ পৃথিবী ও প্রাণী জগতের যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং হযরত মূসাকে (আ) প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযাও। ফেরাউনকে বুঝাবার জন্য হযরত মূসা (আ) যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে একের পর এক যেসব মুজিযা দেখানো হয়েছিল সেগুলোও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

৩০. যাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে। সূরা আ'রাফ ও সূরা শূ'আরায় বিস্তারিতভাবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে একথা পেশ করেছিলেন। এ মু'জিযা দেখে ফেরাউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে,

"তোমার যাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও।" কোনো যাদুকর যাদুর জোরে কোনো দেশ জয় করে নিয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে পূর্বে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি এবং পরবর্তীকালেও ঘটতে দেখা যায়নি। ফেরাউনের নিজের দেশে শত শত যাদুকর ছিল, যারা যাদুর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেবার জন্য হাত পাততো। এ জন্য ফেরাউনের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা এবং অন্যদিকে তিনি তার রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা তার স্পষ্ট দিশেহারা হয়ে যাবার আলামত পেশ করে। আসলে হযরত মূসার ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং মুজিযাগুলো দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে, শুধুমাত্র তার সভাসদরাই নয় বরং তার সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকল প্রজাই এ থেকে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাই সে মিথ্যা, প্রতারণা ও হিংসার পথে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা শুরু করলো। সে বললো, এসব মু'জিযা নয়, যাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক যাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে। সে বললোঃ হে জনতা! ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী গণ্য করছে। সে আরো বললো ঃ হে জনতা! সাবধান হয়ে যাও, এ ব্যক্তি নবী-টবী কিছুই নয়, এ আসলে ক্ষমতালোভী। এ ব্যক্তি ইউসুফের জামানার মতো আবার বনী ইসরাঈলকে এখানে শাসন কর্তৃত্বে বসিয়ে দিতে এবং কিবতীদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়। এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ফেরাউন সত্যের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ টীকা, সূরা ইউনুস ৭৫ টীকা) এ প্রসংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, প্রতি যুগে ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের আহবায়কদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগই এনেছে যে, তারা ক্ষমতালোভী এবং এ উদ্দেশ্যেই সব কথা বলছে। এর দৃষ্টান্ত দেখুন সূরা আ'রাফের ১১০ ও ১৩৩, সূরা ইউনুসের ৭৮ এবং সূরা আল মু'মিনূনের ২৪ আয়াতসমূহে।

৩১. ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার যাদুকরদের লাঠি ও দড়িদড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেই তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব লোকদের ওপর পড়ছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। হযরত মূসাও মনেপ্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ জন্য কোনো পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার দরকার নেই। উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে। সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে। সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে। সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে। আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোনো অবকাশই না থাকে।

৩২. ফেরাউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। তারা এর ফায়সালার সাথে নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করছিল। সারা দেশে লোক পাঠানো হয়। যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শি যাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। এভাবে জনগণকে হাযির করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হয়। এভাবে বেশী বেশী লোক একত্র হয়ে যাবে এবং তারা স্বচক্ষে যাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে। প্রকাশ্যে বলা হতে লাগলো আমাদের ধর্ম এখন যাদুকরদের তেলেসমাতির

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

মূসা (যথা সময় প্রতিপক্ষ দলকে সম্বোধন করে) বললো,[৩৩] "দুর্ভাগ্যপীড়িতরা! আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিয়ো না,[৩৪] অন্যথায় তিনি কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যে-ই মিথ্যা রটনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।"

একথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলো এবং তারা চুপিচুপি পরামর্শ করতে লাগলো[৩৫] শেষে কিছু লোক বললো,[৩৬] "এরা দুজন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য।[৩৭] আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো।[৩৮] ব্যস, জেনে রাখো, আজকে যে প্রাধান্য লাভ করবে সেই জিতে গেছে।"

ওপর নির্ভর করছে। তারা জিতলে আমাদের ধর্ম বেঁচে যাবে, নয়তো মূসার ধর্ম চারদিকে ছেয়ে যাবেই। (দেখুন সূরা শূ'আরা ৩ রুকূ)

এ ক্ষেত্রে এ সত্যটিও সামনে থাকা দরকার যে, মিসরের রাজ পরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর ধর্ম জনগণের ধর্ম থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। উভয়ের দেবতা ও মন্দির আলাদা ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানও এক ধরনের ছিল না। আর মৃত্যুপরের জীবনের ব্যাপারেও মিসরে যার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী, উভয়ের কার্যকর পদ্ধতি ও আদর্শিক পরিণামে অনেক বড় ফারাক পাওয়া যেতো। (দেখুন টয়েনবির লেখা A Study of History বইয়ের ৩১-৩২ পৃষ্ঠা) তাছাড়া মিসরে ইতিপূর্বে যে ধর্মীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ফলে সেখানকার জনগণের মধ্যে এমন একাধিক গ্রুফ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা মুশরিকী ধর্মের তুলনায় একটি তাওহীদী ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছিল অথবা দিতে পারতো। যেমন বনী ইসরাঈল এবং তাদের স্বধর্মীয় লোকেরা। এরা জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ ছিল। এ ছাড়াও রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় ফেরাউন আমিনোফিস বা আখনাতুন (খৃঃ পূঃ ১৩৭৭-১৩৬০) যে ধর্ম বিপ্লব অনুষ্ঠান করেছিলেন তারপর তখনো পুরো দেড়শ বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। এ বিপ্লবের

মাধ্যমে সমস্ত উপাস্যদেরকে খতম করে একমাত্র একক উপাস্য "অতুন"কে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছিল। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির জোরেই এ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তবুও সে তার কিছু না কিছু প্রভাব রেখে গিয়েছিল। এসব অবস্থা সামনে রাখলে সে সময় ফেরাউনের মনে যে ভীতি ও আশংকা জাগছিল তা পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে।

৩৩. হযরত মূসার এ সম্বোধন জনগণের প্রতি ছিল না। কারণ হযরত মূসা মু'জিযা দেখাচ্ছেন, না যাদু দেখাচ্ছেন—তখনো পর্যন্ত জনগণ এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কাজেই এ সম্বোধন ছিল ফেরাউন ও তার সভাসদদের প্রতি। কারণ তারাই তাঁকে যাদুকর গণ্য করছিল।

৩৪. অর্থাৎ এ মু'জিযাকে যাদু এবং এর নবীকে যাদুকর গণ্য করো না।

৩৫. এ থেকে জানা যায়, এরা মনে মনে নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করছিল। এরা জানতো হযরত মূসা যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয়। এরা প্রথম থেকেই দোটানা মনোভাব ও ভীতি সহকারে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তারপর যখন নির্ধারিত সময়ে হযরত মূসা তাদেরকে উচ্চৈস্বরে আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন তখন অকস্মাত তাদের দৃঢ় সংকল্প কেঁপে উঠলো। সম্ভবত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকবে যে, এত বড় উৎসবে, যেখানে সারা দেশের লোক জমা হয়ে গেছে সেখানে খোলা ময়দানে দিনের উজ্জ্বল আলোকে এ প্রতিযোগিতায় নামা ঠিক হবে কি না। যদি এখানে আমরা পরাজিত হয়ে যাই এবং সবার সামনে যাদু ও মুজিযার ফারাক প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

৩৬. এ উক্তিকারীরা নিশ্চয়ই হবে ফেরাউনী পার্টির চরমপন্থী গ্রুপ, যারা যে কোনো উপায়ে হযরত মূসার বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিল। মনে হয়, দূরদর্শী অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকেরা সামনের দিকে এক পা এগিয়ে যেতেও ইতস্তত করছিল। কিন্তু এ চরমপন্থী আবেগমুখর লোকেরা হয়তো বলেছিলঃ অনর্থক দূরের চিন্তা ত্যাগ করো এবং মন স্থির করে প্রতিযোগিতায় নেমে যাও।

৩৭. অর্থাৎ দুটি বিষয় ছিল তাদের মূল প্রতিপাদ্য। এক, যদি যাদুকররাও মূসার মতো লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেয় তাহলে সাধারণ জন সমাবেশে মূসার যাদুকর হওয়া প্রমাণ হয়ে যাবে। দুই, তারা হিংসার আগুন জ্বালিয়ে শাসক শ্রেণীর মনে অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। তাদেরকে এই মর্মে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসার বিজয় দেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়া এবং তোমাদের আদর্শ (Ideal) জীবন যাপন পদ্ধতির অপমৃত্যুর নামান্তর। তারা দেশের প্রভাবশালী শ্রেণীকে ভয় দেখাচ্ছিল এই বলে যে, মূসা যদি দেশের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তাহলে তোমাদের এ শিল্প, চারুকলা, সুন্দর ও মোহময় সংস্কৃতি এবং তোমাদের নারী স্বাধীনতা (যার চমৎকার নমুনা হযরত ইউসুফের জামানায় মিসরীয় ললনারা পেশ করেছিল) তথা এমন সবকিছু যেগুলো ছাড়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করা যায় না, একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তো শুরু হবে নিছক "কাঠমোল্লাদের" রাজত্ব যা সহ্য করার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো।

قَالُوْا يٰمُوْسٰىٓ اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾

যাদুকররা বললো,[৩৯] "হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, না কি আমরাই আগে নিক্ষেপ করবো ?"

মূসা বললো, "না, তোমরাই নিক্ষেপ করো।"

অকস্মাত তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের দড়িদড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগলো[৪০] এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলে[৪১] আমি বললাম, "ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে।

৩৮. অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। এ সময় যদি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিযোগিতার সংগীন মুহূর্তে সাধারণ জনতার সামনে তোমাদের মধ্যে যদি এ ধরনের কানাকানি ও ইতস্তত ভাব চলতে থাকে তাহলে এখনই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে এবং লোকেরা মনে করতে থাকবে তোমাদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিত নও বরং সংশয় দোলায়িত চিত্তে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছো।

৩৯. মাঝখানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্ণিত হয়নি, যা থেকে জানা যায় যে, উপরোক্ত বক্তব্যের ফলে ফেরাউনের দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং প্রতিযোগিতা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাদুকরদেরকে প্রকাশ্যে ময়দানে চলে আসার হুকুম দেয়া হয়।

৪০. সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ

"যখন তারা নিজেদের তন্ত্রমন্ত্র ছাড়লো, তখন তা দ্বারা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করলো এবং তাদেরকে আতংকিত করে তুললো।"(১১৬ আয়াত)

এখানে একথা বলা হচ্ছে যে, এ প্রভাব শুধুমাত্র সাধারণ লোকদের ওপর পড়েনি, হযরত মূসাও যাদু প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চোখই কেবল এটা অনুভব করেনি বরং তাঁর মস্তিষ্কও অনুভব করছিল যে, লাঠি ও দড়িদড়া সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ
وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ
فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾

ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যাকিছু আছে, এখনি এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে,[৪২] এরা যাকিছু বানিয়ে এনেছে এতো যাদুকরের প্রতারণা এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনো সফল হতে পারে না।" শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত যাদুকরকে সিজদাবনত করে দেয়া হলো[৪৩] এবং তারা বলে উঠলো ঃ "আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে।"[৪৪]

ফেরাউন বললো, "তোমরা ঈমান আনলে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই ? দেখছি, এ তোমাদের গুরু, এ-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল।[৪৫] এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি[৪৬] এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলিবিদ্ধ করছি[৪৭] এরপর তোমরা জানতে পারবে আমাদের দুজনের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী।"[৪৮] (অর্থাৎ আমি না মূসা, কে তোমাদের বেশী কঠিন শাস্তি দিতে পারে।)

৪১. মনে হচ্ছে, যখনই হযরত মূসার মুখ থেকে "নিক্ষেপ করো" শব্দ বের হয়েছে তখনই যাদুকররা অকস্মাত নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়াগুলো তাঁর দিকে ফিঁকে দিয়েছে এবং হঠাৎই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিলবিল করতে করতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশংকার ভাব অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোনো অবাক হবার কথা নয়। মানুষ তো সর্বাবস্থায় একজন মানুষই। একজন নবী নবী হলেও মানবিক আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। তাছাড়া এ সময় হযরত মূসা স্বাভাবিকভাবে এ আশংকাও করে থাকতে পারেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

এখানে একটি কথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। কুরআন এখানে একথার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, নবীও যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। যদিও যাদুকর তাঁর নবুওয়াত কেড়ে নেবার

অথবা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কিংবা যাদুর প্রভাবে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না, তবুও মোটামুটিভাবে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর স্নায়ুর ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার অবশ্য করতে পারে। এ থেকে যারা হাদীসগ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়ার ঘটনাবলী পাঠ করে শুধুমাত্র এ রেওয়ায়াতগুলোকে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হন না বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে থাকেন, তাদের চিন্তাধারার গলদও সামনে এসে যাবে।

৪২. হতে পারে, মু'জিযার মাধ্যমে যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা সামনের যেসব লাঠি ও দড়িদড়া সাপের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলোকে গিলে ফেলেছিল। কিন্তু এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেসব শব্দের সাহায্যে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে বাহ্যত অনুমিত হয় যে, এ অজগরটি লাঠি ও দড়িগুলো গিলে ফেলেনি বরং যে যাদুর প্রভাবে সেগুলো সাপ বলে মনে হচ্ছিল সে প্রভাবটিই নষ্ট করে দিয়েছিল। সূরা আ'রাফ ও সূরা শূ'আরার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ

"যে মিথ্যা তারা তৈরী করছিল তাকে সে গিলে ফেলছিল।" আর এখানে এ শব্দাবলী হচ্ছে ঃ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا "সে গিলে ফেলবে তা, যা তারা তৈরী করে রেখেছে।" একথা স্পষ্ট যে, তাদের মিথ্যা ও কৃত্রিমতা তাদের লাঠি ও দড়িদড়া ছিল না বরং তা ছিল তাদের যাদু, যার বদৌলতে সেগুলোকে সাপের মতো দেখা যাচ্ছিল। তাই আমাদের মতে এ অজগরটি যেদিকেই গেছে সেদিকেই লাঠি ও দড়িগুলো গিলে নিয়ে এমনভাবে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে যার ফলে প্রত্যেকটি লাঠি ও দড়ি স্ব স্ব স্থানে পড়ে রয়েছে।

৪৩. অর্থাৎ মূসার লাঠির কৃতিত্ব দেখার সাথে সাথেই তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এটি নিশ্চিতভাবেই মু'জিযা, যাদু কোনোক্রমেই নয়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে।

৪৪. এর মানে হচ্ছে সেখানে সবাই জানতো কিসের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সমগ্র জনসমাবেশে একজনও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো না যে, মূসার ও যাদুকরদের কলাকৌশলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং কার কৌশল শক্তিশালী সেটিই এখন দেখার বিষয়। সবাই জানতো, একদিকে মূসা নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং নিজের নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ দাবী করছেন যে, তাঁর লাঠি অলৌকিকভাবে অজগরে পরিণত হয়। অন্যদিকে যাদুকরদেরকে জনসমক্ষে আহবান করে ফেরাউন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, লাঠির অজগরে পরিণত হওয়ার অলৌকিক কর্ম নয় বরং নিছক যাদুর তেলেসমাতি। অন্যকথায়, সেখানে ফেরাউন ও যাদুকর এবং সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য অবগত ছিল। কাজেই সেখানে এ মর্মে পরীক্ষা চলছিল যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদুর পর্যায়ভুক্ত, না রব্বুল আলামীনের অসীম কোনো ক্ষমতা ছাড়া অন্য ক্ষমতার সাহায্যে যে মু'জিযা দেখানো যেতে পারে না তার পর্যায়ভুক্ত ? এ কারণে যাদুকররা নিজেদের যাদুকে পরাভূত হতে দেখে

একথা বলেনি, "আমরা মেনে নিলাম, মূসা আমাদের চাইতে বড় যাদুকর।" বরং সংগে সংগেই তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মূসা যথার্থই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাচ্চা পয়গম্বর। তারা চিৎকার করে বলে উঠেছে, আমরা সে আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, যার পয়গম্বর হিসেবে মূসা ও হারুন এসেছেন।

এ থেকে সাধারণ জন সমাবেশে এ পরাজয়ের কি প্রভাব পড়ে থাকবে এবং সারা দেশবাসী এর দ্বারা কি সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবে তা অনুমান করা যেতে পারে। ফেরাউন দেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় মেলায় এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিল এ আশায় যে, মিসরের সব এলাকা থেকে আগত লোকেরা স্বচক্ষে দেখে নেবে লাঠি দিয়ে সাপ তৈরি করা মূসা একার কোনো অভিনব কৃতিত্ব নয়, প্রত্যেক যাদুকরই এটা করতে পারে। ফলে মূসার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু তার এ কৌশলের ফাঁদে সে নিজেই আটকে গেছে এবং গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত লোকদের সামনে যাদুকররাই একযোগে একথার সত্যতা প্রকাশ করেছে যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়, তা হচ্ছে মূলত মু'জিযা। কেবলমাত্র আল্লাহর নবীগণই এ মু'জিযা দেখাতে পারেন।

৪৫. সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا .

"এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা রাজধানীতে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তার মালিকদেরকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো।"

এখানে এ উক্তিটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগসাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের চাঁই ও গুরু। তোমরা মু'জিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের গুরুর যাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং একে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করবে।

৪৬. অর্থাৎ একদিকের হাত ও অন্যদিকের পা।

৪৭. শূলিবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি এ কাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার ওপর একটি তখ্‌তা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধীকে উপরে উঠিয়ে তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে তখ্‌তার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। এভাবে অপরাধী তখ্‌তার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শূলিদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো।

৪৮. এটা ছিল হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য ফেরাউনের সর্বশেষ চাল। সে যাদুকরদেরকে ভয়াবহতম শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে এ স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, সত্যি তাদের ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে গোপন যোগসাজশ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ
مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۖ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا
لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾
اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾
وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ
الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ
وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

যাদুকররা জবাব দিল, "সেই সত্তার কসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না।[৪৯] তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি বড়জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফায়সালা করতে পারো। আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের ভুল-ক্রটিগুলো মাফ করে দেন এবং এ যাদুবৃত্তিকেও ক্ষমা করে দেন, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী।"—প্রকৃতপক্ষে[৫০] যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাযির হবে তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে না জীবিত থাকবে, না মরবে।[৫১] আর যারা তার সামনে মুমিন হিসেবে সৎকাজ করে হাযির হবে তাদের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা, চির হরিৎ উদ্যান, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে পুরস্কার সেই ব্যক্তির যে পবিত্রতা অবলম্বন করে।

ছিল এবং তারা তাঁর সাথে মিলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। কিন্তু যাদুকরদের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল নিষ্ঠা তার এ চাল উল্টে দিল। তারা এ ভয়ংকর শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে একথা নিশ্চতভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, নিছক হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য একটি নির্লজ্জ রাজনৈতিক চাল হিসেবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, তারা সাচ্চা দিলে মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

৪ রুকূ'

আমি[৫২] মূসার কাছে অহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও।[৫৩] কেউ তোমাদের পিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না।

পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষণাত সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল।[৫৪] ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোনো সঠিক পথ দেখায়নি।[৫৫]

৪৯. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আমাদের সামনে যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসে গেছে এবং যে সত্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার মোকাবিলায় আমরা কোনোক্রমেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না।"

৫০. যাদুকরদের উক্তির সাথে এটা আল্লাহর বাড়তি উক্তি। বক্তব্যের ধরন থেকেই একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এ বাক্য যাদুকরদের উক্তির অংশ নয়।

৫১. অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। পুরোপুরি মৃত্যু হবে না। যার ফলে তার কষ্ট ও বিপদের সমাপ্তি সূচিত হবে না। আবার জীবনকে মৃত্যুর ওপর প্রাধান্য দেবার মতো জীবনের কোনো আনন্দও লাভ করবে না। জীবনের প্রতি বিরূপ হবে কিন্তু মৃত্যু লাভ করবে না। মরতে চাইবে কিন্তু মরতে পারবে না। কুরআন মজীদে জাহান্নামের আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এ অবস্থাটি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ। এর কল্পনায়ও হৃদয়-মন কেঁপে ওঠে।

৫২. এরপর দীর্ঘদিন মিসরে অবস্থানকালে যা কিছু ঘটেছিল সেসব আলোচনা মাঝখানে বাদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাবলী বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আ'রাফ ১৫-১৬, সূরা ইউনুস ৯, সূরা মু'মিন ৩-৫ এবং সূরা যুখরুফ ৫ রুকূ' দেখুন।

৫৩. এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ রাতে সমস্ত ইসরাঈলী ও অইসরাঈলী মুসলমানদের

(যাদের জন্য ব্যাপক অর্থবোধক 'আমার বান্দাদের' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) মিসরের সকল এলাকা থেকে হিজরত করে বের হয়ে পড়ার কথা ছিল। তারা সবাই একটি পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে একটি কাফেলার আকারে রওয়ানা হলো। এ সময় সুয়েজ খালের অস্তিত্ব ছিল না। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত এলাকাটাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে এলাকার সকল পথেই ছিল সেনানিবাস। ফলে সেখান দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না। তাই হযরত মূসা লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। সম্ভবত তাঁর পরিকল্পনা ছিল সাগরের তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে সিনাই উপদ্বীপের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু সেদিক থেকে ফেরাউন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঠিক এমন সময় পৌঁছে গেলো যখন এ কাফেলা সবেমাত্র সাগরের তীরেই উপস্থিত হয়েছিল। সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের কাফেলা ফেরাউনের সেনাদল ও সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এমনি সময় মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে হুকুম দিলেন اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ "সমুদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।"

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ

"তখন সাগর ফেটে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরো একটি বড় পর্বত শৃংগের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।"

আর মাঝখান দিয়ে শুধু কাফেলার পার হয়ে যাবার পথ তৈরি হয়ে গেলো না বরং উপরের আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী মাঝখানের এ অংশ শুকিয়ে খটখটে সড়কের আকার ধারণ করলো। এটি সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মু'জিযার বর্ণনা । এ থেকে যারা একথা বলে থাকেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বা জোয়ার ভাটার ফলে সমুদ্রের পানি সরে গিয়েছিল তাদের কথার গলদ সহজেই ধরা পড়ে। কারণ এভাবে যে পানি সরে যায় তা দু'দিকে পর্বত শৃংগের মতো খাড়া হয়ে থাকে না এবং মাঝখানের পানি বিহীন অংশ শুকিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায় না। (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা শূ'আরা ৪৭ টীকা দেখুন।)

৫৪. সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের সাগর অতিক্রম করার পর পরই ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ সমুদ্রের বুকে তৈরি হওয়া এ পথে নেমে পড়লো। (৬৩-৬৪ আয়াত) এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্র তাকে ও তার সেনাদেরকে ডুবিয়ে মারলো। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অন্য তীর থেকে ফেরাউন ও তার সেনাদলকে ডুবে যেতে দেখছিল। (৫০ আয়াত) অন্যদিকে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, ডুবে যাবার সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

"আমি মেনে নিয়েছি যে আর কোনো ইলাহ নেই সেই ইলাহ ছাড়া যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমিও মুসলমানদের অন্তরভুক্ত।"

কিন্তু এ শেষ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়নি এবং জবাব দেয়া হলো ঃ

آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً -

"এখন ঈমান আনছো ? আর ইতিপূর্বে এমন অবস্থা ছিল যে, নাফরমানীতেই ডুবে ছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেই চলছিলে। বেশ, আজ আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।"(৯০-৯২ আয়াত)

৫৫. অতি সূক্ষ্মভাবে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এই মর্মে যে, তোমাদের সরদার ও নেতারাও তোমাদের সে একই পথে নিয়ে যাচ্ছে যেপথে ফেরাউন তার জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও যে, এটা সঠিক পথ নির্দেশনা ছিল না।

এ কাহিনী শেষ করতে গিয়ে মনে হয় বাইবেলের বর্ণনাবলীও পর্যালোচনা করা দরকার। এভাবে যারা বলে থাকে কুরআনের এ কাহিনী বনী ইসরাঈলের থেকে নকল করা হয়েছে তাদের মিথ্যার হাটে হাড়ি ভেঙে যাবে। বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে (Exodus) এ কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তার নিম্নোক্ত অংশগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

এক ঃ ৪ অধ্যায়ের ২-৫ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ লাঠির মু'জিযা হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। আবার ১৭ শ্লোকে তাঁকেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "আর তুমি এ যষ্টি হস্তে করিবে, ইহা দ্বারাই তোমাকে সেই সকল চিহ্ন-কার্য করিতে হইবে।" কিন্তু সামনের দিকে গিয়ে জানা গেল না কেমন করে এ লাঠি হযরত হারুনের হাতে চলে গেলো এবং তিনিই এর সাহায্যে মু'জিযা দেখাতে থাকলেন। ৭ অধ্যায় থেকে নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা অনবরত হযরত হারুনকেই লাঠির মু'জিযা দেখাতে দেখি।

দুই ঃ ৫ অধ্যায়ে ফেরাউনের সাথে হযরত মূসার প্রথম সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহর একত্ব ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে হযরত মূসা ও ফেরাউনের মধ্যে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আদতে তার কোনো উল্লেখই নেই। ফেরাউন বললো; "সদা প্রভূ কে যে, আমি তাহার কথা শুনিয়া ইসরাঈলকে ছাড়িয়া দিব ? আমি সদা প্রভুকে জানি না।" কিন্তু মূসা ও হারুন এর এছাড়া আর কোনো জবাব দিলেন না, "ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।"(৫ ঃ ২-৩)

তিন ঃ যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার সমগ্র কাহিনী নিচের মাত্র এই ক'টি বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোনকে কহিলেন, ফরৌন যখন তোমাদিগকে বলে, তোমরা আপনাদের পক্ষে কোনো অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি হারোনকে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌনের সামনে নিক্ষেপ কর, তাহাতে তাহা সর্প হইবে। তখন মোশি ও হারোন ফেরাউনের নিকট গিয়া সদা প্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন, হারোন ফরৌনের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে

তাহা সর্প হইল। তখন ফরৌনও বিদ্বানদিগকে ও গুণীদিগকে ডাক দিলেন, তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াবলে সেই রূপ করিল। ফলত তাহারা আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল, কিন্তু হারোনের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল।" (৭ ঃ ৮-১২)

কুরআনের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। মূল কাহিনীর সমগ্র প্রাণশক্তি কি মারাত্মকভাবে এখানে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উৎসবের দিন খোলা ময়দানে যথারীতি চ্যালেঞ্জের পর প্রতিযোগিতা হওয়া এবং তারপর পরাজয়ের পর যাদুকরদের ঈমান আনা ছিল মূলত এ কাহিনীর প্রাণ। কিন্তু এখানে তার কোনো উল্লেখই করা হয়নি।

চার ঃ কুরআন বলছে, বনী ইসরাঈলদের মুক্তি ও স্বাধীনতাই ছিল হযরত মূসার দাবী। বাইবেল বলছে, তাঁর দাবী কেবল এতটুকুই ছিল ঃ "আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ৩)

পাঁচ ঃ মিসর থেকে বের হওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা ১১ থেকে ১৪ অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত রূপও আমরা দেখতে পাই। আবার এই সংগে অনেকগুলো অদ্ভূত কথাও জানা যায়। যেমন ১৪ অধ্যায়ের ১৫-১৬ শ্লোকে হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে ঃ "তুমি আপন যষ্টি (জি হাঁ, এখন যষ্টি হযরত হারুনের হাত থেকে নিয়ে হযরত মূসার হাতে দেয়া হয়েছে) তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর ; তাহাতে ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিবে। কিন্তু সামনের দিকে গিয়ে ২১-২২ শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ "মোশি (মূসা) সমুদ্রের উপর আপন হস্ত বিস্তার করিলেন তাহাতে সদা প্রভু সেই সমস্ত রাত্রি ব্যাপি প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। আর ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল।" বুঝতে পারা গেল না যে, এটা মু'জিযা ছিল, না ছিল প্রাকৃতিক ঘটনা ? যদি মু'জিযা থেকে থাকে তাহলে তা লাঠির আঘাতেই সৃষ্ট হয়ে থাকবে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে। আর যদি সত্যি প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে পূর্বীয় বায়ু সমুদ্রকে মাঝখান থেকে ফেড়ে পানিকে দু'দিকে দেয়ালের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং মাঝখানে শুকনো পথ বানিয়ে দিয়েছে, এটা তো দস্তুরমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাতাস কি কখনো এমনি ধরনের কোনো আযব কাণ্ড ঘটিয়েছে ?

তালমূদের বর্ণনা বাইবেল থেকে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন এবং কুরআনের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু উভয়ের মোকাবিলা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এক জায়গা সরাসরি অহী জ্ঞানের ভিত্তিতে ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে এবং অন্য জায়গায় শত শত বছরের জনশ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত বর্ণনাই ঘটনার রূপ নিয়েছে। যার ফলে তা যথেষ্ট বিকৃত হয়েছে। দেখুন ঃ The talmud Selcsction, H. Polano, pp, 150-54

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۞ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۞

হে বনী ইসরাঈল![৫৬] আমি তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং তূরের ডান পাশে[৫৭] তোমাদের উপস্থিতির জন্য সময় নির্ধারণ করেছি[৫৮] আর তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছি[৫৯]—খাও আমার দেয়া পবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে সীমালংঘন করো না, অন্যথায় তোমাদের ওপর আমার গযব আপতিত হবে। আর যার ওপর আমার গযব আপতিত হয়েছে তার পতন অবধারিত। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল।[৬০]

৫৬. মাঝখানে সমুদ্র পার হওয়া থেকে নিয়ে সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা বলা হয়নি। সূরা আ'রাফের ১৬-১৭ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, মিসর থেকে বের হয়েই সিনাই উপদ্বীপে একটি মন্দির দেখে বনী ইসরাঈল নিজেদের জন্য একজন কৃত্রিম খোদার দাবী করে বসেছিল। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৯৮ টীকা)

৫৭. অর্থাৎ তূর পাহাড়ের পূর্ব পাদদেশে।

৫৮. সূরা বাকারার ৬ রুকূ' ও সূরা আ'রাফের ১৭ রুকূ'তে বলা হয়েছে, আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে শরীয়াতের নির্দেশনা দেবার জন্য চল্লিশ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। এর পর মূসা আলাইহিস সালামকে পাথরের ফলকে লিখিত বিধান দেয়া হয়েছিল।

৫৯. মান্না ও সাল্ওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা বাকারাহ ৭৩ ও সূরা আ'রাফ ১১৯ টীকা। বাইবেলের বর্ণনা মতে মিসর থেকে বের হবার পর যখন বনী ইসরাঈল সীন মরুভূমিতে ইলীম ও সীনাইর মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং মজুদ খাদ্য খতম হয়ে গিয়ে অনাহার অর্ধাহারের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই মান্না ও সালওয়ার অবতরণ শুরু হয় এবং ফিলিস্তিনের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত পুরো চল্লিশ বছর ধরে এ ধারাবাহিক কার্যক্রম চলতে থাকে। (যাত্রা পুস্তক ১৬ অধ্যায়, গণনা পুস্তক ১১ ঃ ৭-৯, যিহেশূয় ৫ ঃ ১২) যাত্রা পুস্তকে মান্না ও সালওয়ার নিম্নোক্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

আর[৬১] কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের আগে নিয়ে এলো হে মূসা ?[৬২]

সে বললো, "তারা তো ব্যস আমার পেছনে এসেই যাচ্ছে। আমি দ্রুত তোমার সামনে এসে গেছি হে আমার রব! যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।"

তিনি বললেন, "ভালো কথা, তাহলে শোনো, আমি তোমার পেছনে তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী[৬৩] তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।"

ভীষণ ক্রোধ ও মর্মজ্বালা নিয়ে মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি ?[৬৪] তোমাদের কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে ?[৬৫] অথবা তোমরা নিজেদের রবের গযবই নিজেদের উপর আনতে চাচ্ছিলে, যে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভংগ করলে ?"[৬৬]

"পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবির স্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল। পরে পতিত শিশির উর্দ্ধগত হইলে দেখ ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তু বিশেষ প্রান্তরের উপর পড়িয়া রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণ পরস্পর কহিল উহা কি ? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না।" (১৬ ঃ ১৩-১৫)

"আর ইস্রায়েল কুল ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল তাহা ধনিয়া বীজের মত, শুক্ল বর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।"(১৬ ঃ ৩১)

গণনা পুস্তকে আরো বেশী বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতায় পিষিয়া কিংবা উখলিতে চূর্ণ করিয়া বহগুণাতে সিদ্ধ করিত, ও তদ্দারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত ; তৈলপক্ক পিষ্টকের

ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িল ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।" (১১ ঃ ৮-৯)

এটাও ছিল একটি মু'জিযা। কারণ চল্লিশ বছর পরে বনী ইসরাঈল যখন খাদ্যের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ লাভ করলো তখন খাদ্য সরবরাহের এ ধারাটি বন্ধ করে দেয়া হলো। এখন ঐ এলাকায় বাবুই পাখির প্রাচুর্য নেই এবং মান্নাও কোথাও পাওয়া যায় না। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী বনী ইসরাঈল যে এলাকায় চল্লিশ বছর মরুচারী জীবন যাপন করেছিল গবেষক ও অনুসন্ধানকারীরা সেই সমগ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। কোথাও তারা মান্নার সাক্ষাত পাননি। তবে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদেরকে বোকা বানাবার জন্য অবশ্যি মান্নার হালুয়া বিক্রি করে থাকে।

৬০. অর্থাৎ মাগফিরাতের জন্য রয়েছে চারটি শর্ত। এক, তাওবা। অর্থাৎ বিদ্রোহ, নাফরমানী অথবা শির্ক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা। দুই, ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল এবং কিতাব ও আখেরাতকে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া। তিন, সৎকাজ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের বিধান অনুযায়ী ভালো কাজ করা, চার, সত্যপথাশ্রয়ী হওয়া। অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং তারপর ভুল পথে না যাওয়া।

৬১. এই মাত্র উপরে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখান থেকে তার সাথে আলোচনা সম্পৃক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তূর পাহাড়ের ডান দিকে অবস্থান করো এবং চল্লিশ দিনের মেয়াদ শেষ হলে তোমাদের নির্দেশনামা দেয়া হবে।

৬২. এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে হযরত মূসা আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহের আতিশয্যে আগে চলে গিয়েছিলেন। তূরের ডান পাশের যেখানকার ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের সাথে করা হয়েছিল। সেখানে তখনো কাফেলা পৌঁছুতে পারেনি। ততক্ষণ হযরত মূসা একাই রওয়ানা হয়ে গিয়ে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিলেন। এ সময় আল্লাহ ও বান্দার সাথে যা ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আ'রাফের ১৭ রুকূ'তে। হযরত মূসার আল্লাহর সাক্ষাতের আবেদন জানানো এবং আল্লাহর একথা বলা যে, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না তারপর আল্লাহর একটি পাহাড়ের ওপর সামান্য তাজাল্লি নিক্ষেপ করে তাকে ভেঙে গুড়ো করে দেয়া এবং হযরত মূসার বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, আর তারপর পাথরের তখতিতে লেখা বিধান লাভ করা এসব সেই সময়ের ঘটনা। এখানে এ ঘটনার শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই বর্ণনা করা হচ্ছে। একটি জাতির মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা কিভাবে হয় এবং আল্লাহর নবী এ ফিতনাটি দেখে কেমন অস্থির হয়ে পড়েন, মক্কার কাফেরদেরকে একথা জানানোই এ বর্ণনার উদ্দেশ্য।

৬৩. এটা ঐ ব্যক্তির নাম নয়। বরং শব্দের শেষে সন্বন্ধসূচক ইয়া (ى) ব্যবহারের সুস্পষ্ট আলামত থেকে একথা জানা যায় যে, এটা গোত্র, বংশ বা স্থানের সাথে সম্পর্কিত কোনো শব্দ। তারপর আবার কুরআন যেভাবে আসসামেরী বলে তার উল্লেখ করছে তা থেকে একথাও অনুমান করা যায় যে, সেসময় সামেরী গোত্র, বংশ বা স্থানের বহু লোক ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎস পূজার প্রচলনকারী এ সামেরী। কুরআনের এ জায়গার ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে

বেশী কিছু বর্ণনার দরকার নেই। কিন্তু এ জায়গায় যা বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীরা বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তারা বলেন, (নাউযুবিল্লাহ) এটা কুরআন রচয়িতার মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ এ ঘটনার কয়েকশ বছর পর খৃষ্টপূর্ব ৯২৫ অব্দের কাছাকাছি সময় ইসরাঈল সাম্রাজ্যের রাজধানী "সামেরীয়া" নির্মিত হয়। তারপর এরও কয়েকশ বছর পর ইসরাঈলী ও অইসরাঈলীদের সমন্বয়ে শংকর প্রজন্মের উদ্ভব হয়, যারা "সামেরী" নামে পরিচিত হয়। তাদের মতে এই সামেরীদের মধ্যে অন্যান্য মুশরিকী বিদআতের সাথে সাথে সোনালী বাছুর পূজার রেওয়াজও ছিল এবং ইহুদীদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে নিয়ে থাকবেন। তাই তিনি একে নিয়ে হযরত মূসার যুগের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং এ কাহিনী তৈরি করেছেন যে, সেখানে সোনার বাছুর পূজার প্রচলনকারী সামেরী নামে এক ব্যক্তি ছিল। এ ধরনের কথা এরা হামানের ব্যাপারেও বলেছে। কুরআন এই হামানকে ফেরাউনের মন্ত্রী হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদরা তাকে ইরানের বাদশাহ আখসোয়ার্সের সভাসদ ও উমরাহ "হামান" এর সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, এটা কুরআন রচয়িতার অজ্ঞতার আর একটা প্রমাণ। সম্ভবত এ জ্ঞান ও গবেষণার দাবীদারদের ধারণা প্রাচীন যুগে এক নামের একজন লোক, একটি গোত্র অথবা একটি স্থানই হতো এবং এক নামের দু'জন লোক, গোত্র বা দুটি স্থান হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ প্রাচীনকালের একটি অতি পরিচিত জাতি ছিল সুমেরী। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ইরাক ও তার আশপাশের এলাকায় এ জাতিটি বসবাস করতো আর এ জাতির বা এর কোনো শাখার লোকদেরকে মিসরে সামেরী বলা হতে পারে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর এই সামেরীয়ার মূলের দিকেও নজর দিন। এরি সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই তো পরবর্তীকালে উত্তর ফিলিস্তীনের লোকদেরকে সামেরী বলা হতে থাকে। বাইবেলের বর্ণনা মতে ইসরাঈল রাজ্যের শাসক উমরী "সামর" (বা শেমর) নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পাহাড় কিনেছিলেন যার ওপর পরে তিনি নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু পাহাড়ের সাবেক মালিকের নাম সামর ছিল তাই এ শহরের নাম রাখা হয় সামেরী (বা শামরিয়া)। (১-রাজাবলী ১৬-২৪) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়,সামেরীয়ার অস্তিত্বলাভের পূর্বে "সামর" নামক লোকের অস্তিত্ব ছিল এবং তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে তার বংশ বা গোত্রের নাম সামেরী এবং স্থানের নাম সামেরীয়া হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর ছিল।

৬৪. এর অনুবাদ "ভালো ওয়াদা করেননি"ও হতে পারে। মূল ইবারতের যে অনুবাদ আমি করেছি তার অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে যেসব কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তার সবই তোমরা লাভ করতে থেকেছো। তোমাদের নিরাপদে মিসর থেকে বের করেছেন। দাসত্ব মুক্ত করেছেন। তোমাদের শত্রুকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য তাই মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভালো ভালো ওয়াদা কি পূর্ণ হয়নি ? দ্বিতীয় অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদেরকে শরীয়াত ও আনুগত্যনামা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের মতে তা কি কোনো কল্যাণ ও হিতসাধনের ওয়াদা ছিল না ?

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ۞ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۥ فَنَسِيَ ۞ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۞

তারা জবাব দিল, "আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা ভংগ করিনি। ব্যাপার হলো, লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।"[৬৭]—তারপর[৬৮] এভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেললো। এবং তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলো, যার মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা বলে উঠলো, "এ-ই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, মূসা একে ভুলে গিয়েছে।" তারা কি দেখছিল না যে, সে তাদের কথারও জবাব দেয় না এবং তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও রাখে না ?

৬৫. দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "ওয়াদা পূর্ণ হতে কি অনেক বেশী সময় লাগে যে, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো ?" প্রথম অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, এর পর কি অনেক বেশী সময় অতীত হয়ে গেছে যে, তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে ? তোমাদের বিপদের দিনগুলো কি সুদীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গেছে যে, তোমরা পাগলের মতো বিপথে ছুটে চলেছো ? দ্বিতীয় অনুবাদের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, পথনির্দেশনা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে তো কোনো প্রকার বিলম্ব হয়নি, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য ওজর বা বাহানা হিসেবে দাঁড় করাতে পারো।

৬৬. প্রত্যেক জাতি তার নবীর সাথে যে ওয়াদা করে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এ ওয়াদা হচ্ছেঃ তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর দেয়া নির্দেশের ওপর অবিচল থাকা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী না করা।

৬৭. যারা সামেরীর ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল এটি ছিল তাদের ওজর। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা অলংকার ছুড়ে দিয়েছিলাম। বাছুর তৈরী করার নিয়ত আমাদের ছিল না বা তা দিয়ে কি করা হবে তাও আমাদের জানা ছিল না। এরপর যা কিছু ঘটেছে তা আসলে এমন ব্যাপারই ছিল যে, সেগুলো দেখে আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছি।

"লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম"-এ বাক্যের সোজা অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের পুরুষ ও মেয়েরা মিসরের রীতি অনুযায়ী যেসব ভারী

ভারী গহনা পরেছিল তা এ মরুচারী জীবনে আমাদের জন্য বোঝায় পরিণত হয়েছিল। এ বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবো এ চিন্তায় আমরা পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী এ গহনাগুলো মিসর ত্যাগ করার সময় প্রত্যেক ইসরাঈলী নারী ও পুরুষ তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়েছিল। এভাবে তারা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে লুট করে রাতারাতি হিজরত করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ইসরাঈলী নিজেই এ কাজে ব্রতী হয়েছিল, এ নৈতিক কর্মকাণ্ডটি শুধুমাত্র এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এ মহত কর্মটি আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তাদেরকে শিখিয়েছিলেন এবং নবীকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ নিজেই। দেখুন বাইবেলের যাত্রাপুস্তক এ ব্যাপারে কি বলে ঃ

> "ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, ... তুমি যাও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, ... তোমরা যাত্রাকালে রিক্তহস্তে যাইবে না, কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যলংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিবে ; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে, এই রূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।" (৩ ঃ ১৪-২২)

> "আর সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, ... তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যলংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক। আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। (১১ ঃ ১-৩)

> "আর ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য করিল, ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যলংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল ; আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়রা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।" (১২ ঃ ৩৫-৩৬)

দুঃখের বিষয় আমাদের মুফাসসিরগণও কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বর্ণনা চোখবন্ধ করে উদ্ধৃত করেছেন এবং তাদের এ ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে যে, অলংকারের এ বোঝা আসলে ছিল লুটের বোঝা।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ "আমরা স্রেফ সেগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" এর অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, যখন নিজেদের গহনাপাতির বোঝা বইতে বইতে লোকেরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে তখন পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে যে, সবার গহনাপাতি এক জায়গায় জমা করা হোক এবং কার সোনা ও রূপা কি পরিমাণ আছে তা লিখে নেয়া হোক, তারপর এগুলো গালিয়ে ইট ও শলাকায় পরিণত করা হোক। এভাবে জাতির সামগ্রীক মালপত্রের সাথে গাধা ও গরুর পিঠে এগুলো উঠিয়ে দেয়া যাবে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় অলংকার এনে অলংকারের স্তুপের ওপর নিক্ষেপ করে গিয়ে থাকবে।

৬৮. এখান থেকে এ প্যারার শেষ ইবারত পর্যন্ত চিন্তা করলে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, জাতির জবাব "ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী এ বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন। এ থেকে যে আসল ঘটনা জানা যায় তা হচ্ছে এই

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ۞ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۞ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۞ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۞

৫ রুকূ'

(মূসার আসার) আগেই হারুন তাদেরকে বলেছিল, "হে লোকেরা! এর কারণে তোমরা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো। তোমাদের রব তো করুণাময়, কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার কথা মেনে নাও।" কিন্তু তারা তাকে বলে দিল, "মূসার না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো।"৬৯

মূসা (তার সম্প্রদায়কে ধমকাবার পর হারুনের দিকে ফিরে) বললো, "হে হারুন! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল ? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো ?"৭০

হারুন জবাব দিল, "হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না।৭১ আমার আশংকা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।"৭২

যে; আসন্ন ফিতনা সম্পর্কে বেখবর হয়ে লোকেরা যার যার গহনাপাতি এনে স্তুপীকৃত করে চলেছে এবং সামেরী সাহেবও তাদের মধ্যে শামিল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অলংকার গালাবার দায়িত্ব সামেরী সাহেব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন এবং এমন কিছু জালিয়াতি করেন যার ফলে ইট বা শলাকা তৈরি করার পরিবর্তে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি হয়ে আসে। তার মুখ থেকে গরুর মতো হাম্বা রব বের হতো। এভাবে সামেরী জাতিকে প্রতারিত করে। তার কথা হচ্ছে আমি তো শুধু সোনা গালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্য থেকে তোমাদের এ দেবতা নিজেই স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

৬৯. বাইবেল এর বিপরীত হযরত হারুনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছে যে, বাছুর বানানো এবং তাকে উপাস্য বানানোর মহা পাপ তিনিই করেছিলেন ঃ

"পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠুন আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল। তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন ; এবং একটি ঢালা গো-বৎস নির্মাণ করিলেন, তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এ তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদী নির্মাণ করিলেন এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হইবে।"

(যাত্রা পুস্তক ৩২ ঃ ১-৬)

বনী ইসরাঈলের সমাজে এ ভুল বর্ণনার খ্যাতিলাভের সম্ভাব্য কারণ এও হতে পারে যে, হয়তো সামেরীর নাম হারুনই ছিল এবং পরবর্তী লোকেরা এই হারুনকে হারুন নবীর সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আজ খৃস্টান মিশনারী ও পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা জোর দিয়ে একথাই বলতে চায় যে, এখানেও কুরআন নিশ্চয় ভুল করেছে। তাদের পাক-পবিত্র নবী-ই বাছুরকে ইলাহ বানিয়েছিলেন এবং তাঁর গাত্রাবরণ থেকে এ দাগটি তুলে দিয়ে কুরআন একটি উপকার করেনি বরং উল্টো অপরাধ করেছে। এ হচ্ছে তাদের হঠকারিতার অবস্থা। তবে তারা এটা দেখছেন না যে, এ একই অধ্যায়েই মাত্র কয়েক লাইন পরেই বাইবেল কিভাবে নিজেই নিজের ভুল বর্ণনার রহস্য ভেদ করছে। এ অধ্যায়ের শেষ দশটি শ্লোকে বাইবেল বর্ণনা করছে যে, হযরত মূসা (আ) এরপর লেবীর সন্তানদেরকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর এ হুকুম শুনালেন যে, যারা এ শিরকের মহাপাপে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে এবং প্রত্যেক মু'মিন নিজ হাতে নিজের যেসব ভাই, সাথী ও প্রতিবেশী গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করবে। এভাবে সেদিন তিন হাজার লোক নিহত হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত হারুনকে কেন ছেড়ে দেয়া হলো ? যদি তিনিই এ অপরাধের মূল উদগাতা ও স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে এ গণহত্যা থেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা হলো ? লেবীর সন্তানরা কি তাহলে একথা বলতো না যে, হে মূসা! আমাদের তো হুকুম দিচ্ছো নিজেদের গুনাহগার ভাই, সাথী ও প্রতিবেশীদেরকে নিজেদের হাতে হত্যা করার কিন্তু নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত উঠাচ্ছো না কেন, অথচ আসল গোনাহগার তো সে-ই ছিল ? সামনের দিকে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, মূসা সদাপ্রভুর কাছে গিয়ে আবেদন জানান, এবার বনী ইসরাঈলের গোনাহ মাফ করে দেন, নয়তো তোমার কিতাব থেকে আমার নাম কেটে দাও। একথায় আল্লাহ জবাব দেন, "যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গোনাহ করেছে আমি তার নাম আমার কিতাব থেকে মুছে ফেলবো।" কিন্তু আমরা দেখছি, হযরত হারুনের নাম মুছে ফেলা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে তাঁকে ও তাঁর সন্তান সন্ততিদেরকে বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদ অর্থাৎ বনী লেবীর নেতৃত্ব ও বায়তুল মাকদিসের সেবায়েতের দায়িত্ব দান করা হয়। (গণনা পুস্তক ১৮ ঃ ১-৭) বাইবেলের এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ কি তার নিজের পূর্ববর্তী বর্ণনার প্রতিবাদ ও কুরআনের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে না ?

৭০. হুকুম বলতে এখানে পাহাড়ে যাবার সময় এবং নিজের জায়গায় হযরত হারুনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পূর্ব মুহূর্তে হযরত মূসা তাঁকে যে হুকুম দিয়েছিলেন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। সূরা আ'রাফে একে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

"আর মূসা (যাওয়ার সময়) নিজের ভাই হারুনকে বললো, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো এবং দেখো, সংশোধন করবে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না। (১৪২ আয়াত)

৭১. এ আয়াতগুলোর অনুবাদের সময় আমি এ বিষয়টি সামনে রেখেছি যে, হযরত মূসা ছোট ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন বড়। অন্যদিকে হযরত হারুন বড় ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন ছোট।

৭২. হযরত হারুনের জবাবের অর্থ কখনোই এই নয় যে, জাতির ঐক্যবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথে থাকার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং শিরকের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা তার এমন অনৈক্যের চেয়ে ভালো যার ভিত্তি গড়ে ওঠে হক ও বাতিলের বিরোধের ওপর। কোনো ব্যক্তি যদি এ আয়াতের এ অর্থ করে তাহলে সে কুরআন থেকে গোমরাহী গ্রহণ করবে। হযরত হারুনের পুরো কথাটা বুঝতে হলে এ আয়াতটিকে সূরা আ'রাফের ১৫০ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ز فَلاَ تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

"হে আমার সহোদর ভাই ! এ লোকেরা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি দুশমনদেরকে আমার প্রতি হাসবার সুযোগ দিয়ো না এবং ঐ জালেম দলের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।"

এখন এ উভয় আয়াত একত্র করে দেখলে যথার্থ ঘটনার এ ছবি সামনে আসে যে, হযরত হারুন লোকদেরকে এ গোমরাহী থেকে রুখবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে তিনি এই আশংকায় নীরব হয়ে যান যে, হযরত মূসার ফিরে আসার আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু না হয়ে যায় এবং তিনি পরে এসে এ অভিযোগ না করে বসেন যে, তোমার যখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না তখন তুমি পরিস্থিতিকে এতদূর গড়াতে দিলে কেন ? আমার আসার অপেক্ষা করলে না কেন ? সূরা আ'রাফের আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও একথাই প্রতিভাত হয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে উভয় ভাইয়ের একদল শত্রু ছিল।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾

মূসা বললো, "আর হে সামেরী তোমার কি ব্যাপার ?"

*সে জবাব দিল, "আমি এমন জিনিস দেখেছি যা এরা দেখেনি, কাজেই আমি রসূলের পদাংক থেকে এক মুঠো তুলে নিয়েছি এবং তা নিক্ষেপ করেছি, আমার মন আমাকে এমনি ধারাই কিছু বুঝিয়েছে।"*৭৩

৭৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি দলের পক্ষ থেকে অদ্ভুত ধরনের টানা হেঁচড়া করা হয়েছে।

একটি দলে আছেন প্রাচীন তাফসীরকারগণ এবং প্রাচীন প্রদ্ধতিতে তাফসীরকারীদের বৃহত্তম অংশ। তারা এর অর্থ বর্ণনা করেন, "সামেরী রসূল অর্থাৎ হযরত জিব্রীলকে যেতে দেখে নিয়েছিল এবং তাঁর পদাংক থেকে এক মুঠো মাটি উঠিয়ে নিয়েছিল। আর এই মাটি যখন বাছুরের মূর্তির মধ্যে রাখা হয়েছিল। তখন তার অলৌকিক মহিমায় তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ স্পন্দন এবং একটি জীবন্ত বাছুরের মতো হাম্বা রব তার মুখ থেকে বের হতে শুরু হয়েছিল।" অথচ সত্যিই যে এমনটি হয়েছিল তা অবশ্য কুরআন বলছে না। কুরআন স্রেফ এতটুকু বলছে যে, হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে সামেরী একথা বানিয়ে বলেছিল। এ অবস্থায় আমরা বুঝতে পারছি না, মুফাসসিরগণ কেমন করে একে একটি সত্য ঘটনা এবং কুরআন বর্ণিত যথার্থ সত্য মনে করে বসলেন।

দ্বিতীয় দলটি সামেরীর কথার অন্য একটি অর্থ করেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামেরী আসলে বলেছিল, "আমি রসূল অর্থাৎ মূসার দীনের মধ্যে এমন দুর্বলতা দেখেছিলাম যা অন্যেরা দেখতে পায়নি। তাই আমি একদিক থেকে তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেছিলাম।" এ ব্যাখ্যাটি সম্ভবত সর্বপ্রথম করেন আবু মুসলিম ইসফাহানী। তারপর ইমাম রাযী একে নিজের তাফসীরে উদ্ধৃত করে এর প্রতি নিজের সমর্থন প্রকাশ করেন। বর্তমানে আধুনিক তাফসীরকারদের অধিকাংশই এ অর্থটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। কিন্তু তারা একথা ভুলে গেছেন যে, কুরআন ধাঁধা ও হেয়ালির ভাষায় নাযিল হয়নি বরং পরিষ্কার ও সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। একজন সাধারণ আরববাসী নিজের ভাষার প্রচলিত স্বাভাবিক বাগধারা অনুযায়ী এর বক্তব্য বুঝতে সক্ষম। আরবী ভাষার সাধারণ প্রচলিত বাকরীতি ও দৈনন্দিন কথোপকথনের শব্দাবলী সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তি কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, সামেরীর এ মনোভাব প্রকাশ করার জন্য সহজ-সরল আরবী ভাষায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হবে যা এ আয়াতের তাফসীরকারগণ বলেছেন। অথবা একজন সাধারণ আরবীয় একথাগুলো শুনে কখনো এমন অর্থ গ্রহণ করতে পারে না যা এ তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন। অভিধান গ্রন্থ থেকে কোনো একটি শব্দের এমন একাধিক অর্থ গ্রহণ করা যা বিভিন্ন প্রবাদে ব্যবহৃত

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ إِلٰٓى إِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

মূসা বললো, "বেশ, তুই দূর হয়ে যা, এখন জীবনভর তুই শুধু একথাই বলতে থাকবি, 'আমাকে ছুঁয়ো না।'[৭৪] আর তোর জন্য জবাবদিহির একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে যা কখনোই তোর থেকে দূরে সরে যাবে না। আর দেখ, তোর এই ইলাহর প্রতি, যার পূজায় তুই মত্ত ছিলি, এখন আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেবো এবং তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো সাগরে ভাসিয়ে দেবো। হে লোকেরা ! এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, প্রত্যেক জিনিসের ওপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।"

হে মুহাম্মাদ![৭৫] এভাবে আমি অতীতে যা ঘটে গেছে তার অবস্থা তোমাকে শুনাই এবং আমি বিশেষ করে নিজের কাছ থেকে তোমাকে একটি 'যিকির' (উপদেশমালা) দান করেছি।[৭৬] যে ব্যক্তি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিন কঠিন গোনাহের বোঝা উঠাবে।

হয়ে থাকে এবং তার মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থ নিয়ে এমন একটি বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া যেখানে একজন সাধারণ আরব কখনোই এ শব্দটিকে এ অর্থে ব্যবহার করে না—এটাতো ভাষাজ্ঞান হতে পারে না, তবে বাগাড়ম্বর হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি নেই। 'ফরহংগে আসেফীয়া' নামক উর্দু অভিধান খানি অথবা 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' হাতে নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি যথাক্রমে তাদের উর্দু ও ইংরেজী রচনাগুলোর মধ্যে এ ধরনের কৃতিত্ব ফলাতে থাকেন, তাহলে সম্ভবত নিজেদের কথার দু-চারটে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনেই তাদের লেখকরা চিৎকার করে উঠবেন। সাধারণত কুরআনের এ ধরনের ব্যাখ্যা এমন সময় করা হয় যখন এক ব্যক্তি কোনো আয়াতের সহজ সরল অর্থ দেখে নিজে নিজেই একথা মনে করে থাকে যে, এখানে তো আল্লাহ তা'আলা বড়ই অসাবধান হয়ে গেছেন, এসো আমি তাঁর কথা এমনভাবে পেশ করে দিই যার ফলে তাঁর ভুলের পরদা ঢেকে যাবে এবং তাঁর বক্তব্য নিয়ে লোকদের হাসাহাসি করার সুযোগ থাকবে না।

এ বিকৃত চিন্তা পরিহার করে যে ব্যক্তিই এ বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি পড়বে সে সহজে বুঝতে পারবে যে, সামেরী ছিল একজন ফিতনাবাজ ব্যক্তি। সে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে ধোঁকা ও প্রতারণার একটি বিরাট পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। সে কেবল একটি সোনার বাছুর তৈরি করে যে কোনো কৌশলে তার মধ্যে গো-বৎসের হাম্বা রব সৃষ্টি করে দেয়নি এবং সমগ্র জাতির অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রতারিত করেনি বরং সে আরো দুঃসাহসী হয়ে খোদ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকেও একটি প্রতারণাপূর্ণ গল্প শুনিয়ে দিল। সে দাবী করলো, আমি এমন কিছু দেখেছি যা অন্যেরা দেখেনি। সাথে সাথে এ গল্পও শুনিয়ে দিল যে, রসূলের পদাংকের এক মুঠো মাটিই এ কেরামতি দেখিয়েছে। রসূল বলে সে জিব্রীলকেও নির্দেশ করতে পারে, যেমন প্রাচীন তাফসীরকারগণ মনে করেছেন। কিন্তু যদি একথা মনে করা হয় যে, রসূল শব্দটি বলে সে হযরত মূসাকে নির্দেশ করেছে, তাহলে এটা তার আর একটা প্রতারণা। সে এভাবে হযরত মূসাকে মানসিক উৎকোচ দিতে চাচ্ছিল, যাতে তিনি এটাকে তাঁর নিজের পদাংকের অলৌকিকতা মনে করে গর্বিত হন এবং নিজের অন্যান্য কেরামতির প্রচারণার জন্য সামেরীর যোগ্যতাকে স্থায়ীভাবে কাজে লাগান। কুরআন এ সমগ্র ব্যাপারটিকে সামেরীর প্রতারণা হিসেবেই পেশ করছে, নিজের পক্ষ থেকে প্রকৃত ঘটনা হিসেবে পেশ করছে না। তাই এতে এমন দূষণীয় কিছু ঘটেনি যে, তা প্রক্ষালনের জন্য অভিধান গ্রন্থগুলোর সাহায্যে অযথা বাগাড়ম্বর করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। বরং পরবর্তী বাক্যগুলোতে হযরত মূসা যেভাবে তাকে ধিক্কার ও অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, তার বানানো এ প্রতারণাপূর্ণ গল্প শোনার সাথে সাথেই তিনি তা তার মুখের উপরে ছুড়ে মেরেছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ শুধু এতটুকুই নয় যে, সারাজীবনের জন্য মানব সমাজের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে এবং তাকে অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখা হয়েছে বরং তার ওপর এ দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সে নিজের অচ্ছুৎ হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে দেবে এবং দূর থেকেই লোকদেরকে এ মর্মে বলতে থাকবে, "আমি অচ্ছুৎ আমাকে ছুয়ো না।" বাইবেলের লেবীয় পুস্তকে কুষ্ঠরোগীর স্পর্শ থেকে লোকদের বাঁচাবার জন্য যে নিয়ম বাতলানো হয়েছে তার মধ্য থেকে একটি নিয়ম হচ্ছে এই ঃ

> "আর যে কুষ্ঠির ঘা হইয়াছে। তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তার মস্তক মুক্ত কেশ থাকিবে ও সে আপনার ওষ্ঠ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি, অশুচি' এ শব্দ করিবে। যতদিন তাহার গাত্রে ঘা থাকিবে, ততদিন সে অশুচি থাকিবে ; সে অশুচি ; সে একাকী বাস করিবে, শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।" (১৩ ঃ ৪৫-৪৬)

এ থেকে অনুমিত হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করা হয়ে থাকবে অথবা তার জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়ে থাকবে যে, শারীরিকভাবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেভাবে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে নৈতিক কুষ্ঠে আক্রান্ত রোগীকেও মানুষদের থেকে আলাদা করে দিতে হবে এবং এ ব্যক্তিও কুষ্ঠরোগীর মতো চিৎকার করে করে তার কাছে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলতে থাকবে ঃ আমি অপবিত্র, আমাকে ছুঁয়ো না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۭ وَسَاۗءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ زُرْقًا ۝ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

আর এ ধরনের লোকেরা চিরকাল এ দুর্ভাগ্য পীড়িত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (এ অপরাধের দায়ভার) বড়ই কষ্টকর বোঝা হবে।[৭৭] সেদিন যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে[৭৮] এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে আনবো যে, তাদের চোখ (আতংকে) দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে।[৭৯] তারা পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি করবে, দুনিয়ায় বড়জোর তোমরা দশটা দিন অতিবাহিত করেছো'[৮০]—আমি[৮১] ভালোভাবেই জানি তারা কিসব কথা বলবে, (আমি এও জানি) সে সময় তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সতর্ক অনুমানকারী হবে সে বলবে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবনতো মাত্র একদিনের জীবন ছিল।

৭৫. মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী খতম করে আবার ভাষণের মোড় সেদিকে ফিরে যাচ্ছে যা দিয়ে সূরার সূচনা হয়েছিল। সামনে এগিয়ে যাবার আগে আর একবার সূরার সেই প্রারম্ভিক আয়াতগুলো পড়ে নিন .... যেগুলোর পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে ভালোভাবে বুঝা যাবে, সূরার আসল আলোচ্য বিষয় কি, মাঝখানে মূসার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে কেন এবং কাহিনী খতম করে কিভাবে ভাষণটি তার মূল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে আসছে।

৭৬. অর্থাৎ এ সূরার প্রথমে যে কুরআনের কথা বলা হয়েছিল সেটা এমন কোনো বিষয় ছিল না যার মাধ্যমে তোমাদের কোনো অসম্ভব কাজে লিপ্ত করা বা তোমাদের ওপর অনর্থক একটা কষ্টকর কাজ চাপিয়ে দেবার জন্য তা নাযিল করা হয়েছিল। সেটা তো ছিল একটা স্মারক ও উপদেশ (তাযকিরাহ) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে অন্তরে আল্লাহকে ভয় করে।

৭৭. এখানে প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উপদেশবাণী অর্থাৎ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তার বিধান ও পথ নির্দেশনা গ্রহণে অস্বীকার করবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। এর ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁকে প্রেরণকারী আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। তার এ নির্বুদ্ধিতা হবে তার নিজেরই সাথে শত্রুতারই নামান্তর। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির কাছে কুরআনের এ নসীহত পৌঁছে গেছে এবং সে এটা গ্রহণ করতে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে ও ইতস্তত করছে সে আখেরাতে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আয়াতের শব্দাবলী ব্যাপক অর্থ প্রকাশক। কোনো দেশ,

জাতি ও সময়ের সাথে সেগুলো বিশেষভাবে সম্পর্কিত নয়। যতদিন এ কুরআন দুনিয়ায় থাকবে, যেখানে, যে দেশে এবং যে জাতি ও ব্যক্তির কাছে এটা পৌছে যাবে সেখানে তার জন্যে দুটোই পথ খোলা থাকবে। তৃতীয় কোনো পথ সেখানে থাকবে না। হয় একে মেনে নিয়ে এর আনুগত্য করতে হবে আর নয়তো একে অস্বীকার করে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। প্রথম পথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি সামনের দিকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি এ আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে।

৭৮. সিংগা মানে রণভেরী, রণতুর্য। আজকাল এর বিকল্প হিসেবে বিউগল বলা যেতে পারে। সেনাদলকে একত্র ও বিক্ষিপ্ত করার এবং নির্দেশ দেবার জন্য বিউগল বাজানো হয়। আল্লাহ তাঁর বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন যা মানুষের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ শব্দ ও পরিভাষাগুলো ব্যবহার করার মূল লক্ষ হচ্ছে আমাদের ধারণা, কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে আসল জিনিসের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। আমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাজ্যের বিভিন্ন জিনিসকে হুবহু এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করবো এবং সেগুলোকে এসব সীমিত আকারের জিনিস মনে করে নেবো যেমন আমাদের জীবনে পাওয়া যায়, এটা কখনোই এর উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত লোকদের জমা করার এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করার জন্য এমন কোনো না কোনো জিনিস বাজানো বা কোনো কিছুতেই ফুঁক দিয়ে বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করা হয় যা রণভেরী, রণতুর্য বা বিউগলের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন এমনি একটি জিনিসে ফুঁক দেয়া হবে (যা আমাদের বিউগলের মতো। একবার তাতে ফুঁক দেয়া হবে,) তখন সবাই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন সবাই জেগে উঠবে এবং পৃথিবীর সব দিক থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে আসতে থাকবে। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ১০৬ টীকা।)

৭৯. মূল শব্দ "যুরকান"। এটা হচ্ছে "আযরাক"-এর বহুবচন। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যারা 'আযরাক' বা সাদাটে নীলচে ভাব ধারণ করবে। কারণ ভয়ে ও আতংকে তাদের রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। আবার অন্য কিছু লোক এ শব্দকে "আযরাকুল আয়েন" বা নীল চক্ষুওয়ালার অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন অত্যধিক ভয়ে তাদের চোখের মণি থির হয়ে যাবে। যখন কারোর চোখ আলোহীন হয়ে পড়ে তখন তার চোখের মণি সাদা হয়ে যায়।

৮০. এর আরেকটি মানে এও হতে পারে, "মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তোমাদের বড় জোর দশ দিন অতিবাহিত হয়ে থাকবে।" কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থান থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন লোকেরা নিজেদের দুনিয়াবি জীবন সম্পর্কেও আন্দায করে নেবে যে, তা ছিল অতি সামান্য দিনের এবং মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে সময়কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে সে সম্পর্কেও তাদের এ প্রায় একই ধরনের অনুমান হবে। কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ○

"আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে ? জবাব দেবে, একদিন বা দিনের এক অংশ থেকেছি, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"
(আল মু'মিনূন ঃ ১১২-১১৩)

অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُوْا يُوْفَكُوْنَ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ○

"আর যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা (মৃত অবস্থায়) এক ঘন্টার বেশী সময় পড়ে থাকিনি। এভাবে তারা দুনিয়ায়ও ধোঁকা খেতে থেকেছে। আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী তোমরা তো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে থেকেছো এবং আজ সে পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।" (আর রূম ঃ ৫৫-৫৬)

এসব সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় দুনিয়ার জীবন ও আলমে বরযখের (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) জীবন উভয়কে তারা সামান্য মনে করবে। দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে তারা একথা এজন্য বলবে যে, নিজেদের আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় একটি চিরন্তন জীবনে যখন তাদের চোখ মেলতে হবে এবং যখন তারা দেখবে এখানকার জন্য তারা কিছুই তৈরি করে আনেনি, তখন চরম আক্ষেপ ও হতাশার সাথে তারা নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে ফিরে দেখবে এবং দুঃখ করে বলতে থাকবে, হায় ! মাত্র দু'দিনের আনন্দ ও ভোগ বিলাসের লোভে আমরা চিরকালের জন্য নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলাম। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জীবনকাল তাদের কাছে সামান্য মনে হবে, কারণ মৃত্যুপরের জীবনকে তারা দুনিয়ায় অসম্ভব মনে করতো এবং কুরআন বর্ণিত পরকালীন জগতের ভুগোল কখনোই গুরুত্ব সহকারে তাদের কাছে গৃহীত হয়নি। এ ধারণা-কল্পনা নিয়েই তারা দুনিয়ার জীবনের সচেতন মুহূর্তগুলো নিশেষ করেছিল। আর এখন হঠাৎ চোখ মেলতেই সামনে দেখবে দ্বিতীয় জীবনের সূচনা। এ জীবনের শুরুতেই বিউগলের বিকট আওয়াজে নিজেদের দেখবে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যেতে। ভীষণ আতংকের মধ্যে এখন তারা মনে করতে থাকবে ওমুক হাসপাতালে বেহুশ হবার পর অথবা ওমুক জাহাজ থেকে সমুদ্রে ডুবে যাবার পর কিংবা অমুক স্থানে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কতটুকু সময়ই বা কেটে গেছে। তাদের মগজে একথা আসবেই না যে, দুনিয়ায় তারা মারা পড়েছিল এবং এখন সেই দ্বিতীয় জীবনটিই শুরু হয়েছে, যাকে তারা

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۝١٠٥ فَيَذَرُهَا
قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٦ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۝١٠٧ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ
لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨ يَوْمَئِذٍ
لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا ۝١٠٩ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ۝١١٠

৬ রুকূ'

—এ লোকেরা[৮২] তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে ? বলো, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে তোমরা কোনো উঁচু নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।[৮৩]—সেদিন সবাই নকীবের আহ্বানে সোজা চলে আসবে, কেউ সামান্য দর্পিত ভংগীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না এবং করুণাময়ের সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ[৮৪] ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না। সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পসন্দ করেন।[৮৫]—তিনি লোকদের সামনের পেছনের সব অবস্থা জানেন এবং অন্যেরা এর পুরো জ্ঞান রাখে না।[৮৬]

একেবারে অর্থহীন ও অযৌক্তিক বলে ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিতো। তাই তাদের প্রত্যেকেই একথা মনে করতে থাকবে, সম্ভবত আমি কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম এবং এখন এমন এক সময় আমার চেতনা ফিরে এসেছে অথবা ঘটনাক্রমে এমন এক জায়গায় আমি পৌঁছে গেছি যেখানে কোনো রকমের দুর্ঘটনার কারণে লোকেরা একদিকে দৌড়ে চলছে। এটাও অসম্ভব মনে হয় না যে, আজকাল যারা মরছে তারা কিয়ামতের শিংগার আওয়াজকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিমান আক্রমণের পূর্বের সতর্কতামূলক সাইরেন ধ্বনি বলে মনে করতে থাকবে।

৮১. এটি একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। ভাষণের মাঝখানে এর সাহায্যে শ্রোতাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রোতাদের মনে এ সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে সময় হাশরের ময়দানে ছুটে চলা লোকেরা চুপিসারে যে আলাপ করবে তা আজ এখানে কেমন করে বর্ণনা করা হচ্ছে ?

৮২. এটিও একটি প্রাসংগিক বাক্য। ভাষণের মাঝখানে কোনো শ্রোতার প্রশ্নের জবাবে এ বাক্যটি বলা হয়েছে। মনে হয় যখন এ সূরাটি একটি ঐশী ভাষণ হিসেবে শুনানো হচ্ছিল তখন কেউ বিদ্রূপ করার জন্য এ প্রশ্নটি উঠিয়েছিল যে, কিয়ামতের যে চিত্র আপনি আঁকছেন তাতে তো মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ার লোকেরা কোনো সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলতে থাকবে। তাহলে এ বিশালাকৃতির পাহাড়গুলো তখন কোথায় চলে যাবে ? এ প্রশ্নের সুযোগটি বুঝার জন্য যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল সেটি সামনে রাখতে হবে। মক্কা যে স্থানে অবস্থিত তার অবস্থা একটি জলধারের মতো, যার চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। প্রশ্নকারী এ পাহাড়গুলোর প্রতি ইংগিত করে একথা বলে থাকবে। অহীর ইশারায় উপস্থিত ক্ষেত্রে তখনই এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, এ পাহাড়গুলো ভেঙ্গে বালুকারাশির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া হবে এবং সেগুলো ধূলোমাটির মতো সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেয়া হবে যেখানে কোনো উঁচু-নীচু, ঢালু বা অসমতল জায়গা থাকবে না। তার অবস্থা এমন একটি পরিষ্কার বিছানার মতো হবে যাতে সামান্যতমও খাঁজ বা ভাঁজ থাকবে না।

৮৩. পরকালীন জগতে পৃথিবী যে নতুন রূপ নেবে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ "যখন পৃথিবী বিস্তৃত করে দেয়া হবে।" সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে ঃ إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ "যখন সাগর চিরে ফেলা হবে।" এর অর্থ সম্ভবত এই হবে যে, সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমস্ত পানি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে চলে যাবে। সূরা তাকবীরে বলা হয়েছে ঃ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ "যখন সমুদ্র ভরে দেয়া হবে বা সমান করে দেয়া হবে।" এখানে বলা হচ্ছে যে, পাহাড়গুলো ভেংগে গুঁড়ো গুঁড়ো করে সারা পৃথিবীকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। মনের পাতায় এর যে আকৃতি গড়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, পরকালীন দুনিয়ায় সমস্ত সমুদ্র ভরাট করে, পাহাড়গুলো ভেংগে উঁচু-নীচু সমান করে, বন-জংগল সাফ করে পুরোপুরি একটি বলের গাত্রাবরণের মতো সমান ও মসৃন করে দেয়া হবে। এ আকৃতি সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "এমন দিন যখন পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে ভিন্ন কিছু করে দেয়া হবে।" এ আকৃতির পৃথিবীর ওপর হাশর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ সেখানে আদালত তথা ন্যায়বিচার কায়েম করবেন। তারপর সবশেষে তাকে যে আকৃতি দান করা হবে সূরা যুমারের ৭৪ আয়াতে তা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

অর্থাৎ মুত্তাকীরা "বলবে, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের দ্বারা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। কাজেই সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এ থেকে জানা যায়, সবশেষে এ সমগ্র পৃথিবীটিকেই জান্নাতে পরিণত করা হবে এবং আল্লাহর মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল বান্দারা হবে এর উত্তরাধিকারী। সে সময় সারা পৃথিবী একটি দেশে পরিণত হবে। পাহাড়-পর্বত, সাগর, নদী, মরুভূমি আজ পৃথিবীকে অসংখ্য দেশে বিভক্ত করে রেখেছে এবং এ সাথে বিশ্বমানবতাকেও বিভক্ত করে দিয়েছে। এগুলোর সেদিন কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। (উল্লেখ্য সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহও এ মত পোষণ করতেন যে, জান্নাত এ পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সূরা নাজম-এর عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى আয়াতের ব্যাখ্যা তারা এভাবে করেন যে, এখানে এমন জান্নাতের কথা বলা হয়েছে যেখানে এখন শহীদদের রূহ রাখা হয়।)

৮৪. মূলে 'হাম্‌স' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি পায়ের আওয়াজ, চপিচুপি কথা বলার আওয়াজ, উটের চলার আওয়াজ এবং আরো এ ধরনের হাল্‌কা আওয়াজের জন্য বলা হয়। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া চুপিচুপি গুনগুন করে কথা বলার কোনো আওয়াজ শোনা যাবে না। চতুর্দিকে একটি ভয়ংকর ভীতিপ্রদ পরিবেশ বিরাজ করবে।

৮৫. এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। একটি অনুবাদ আমরা অবলম্বন করেছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না তবে যদি কারো পক্ষে করুণাময় এর অনুমতি দেন এবং তার জন্য কথা শুনতে রাজি হয়ে যান।" এখানে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উভয় অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশ করার জন্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে মুখ খোলা তো দূরের কথা, টুশব্দটি করারও কারোর সাহস হবে না। আল্লাহ যাকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। এ দু'টি কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ.

"কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে ?"

(সূরা আল বাকারা ২৫৫ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰۤئِكَةُ صَفًّا ۖ لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ

"সেদিন যখন রূহ ও ফেরেশতারা সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, একটুও কথা বলবে না, শুধুমাত্র সে-ই বলতে পারবে যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যে ন্যায়সংগত কথা বলবে।" (আন নাবা, ৩৮ আয়াত)

অন্যদিকে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

"আর তারা কারোর সুপারিশ করে না সেই ব্যক্তির ছাড়া যার পক্ষে সুপারিশ শোনার জন্য (রহমান) রাজী হবেন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।"
(সূরা আল আম্বিয়া, ২৮ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى -

"কত ফেরেশতা আকাশে আছে, তাদের সুপারিশ কোনোই কাজে লাগবে না, তবে একমাত্র তখন যখন আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেবার পর সুপারিশ করা হবে এবং এমন ব্যক্তির পক্ষে করা হবে যার জন্য তিনি সুপারিশ শুনতে চান এবং পছন্দ করেন।" (সূরা আন নাজম, ২৬ আয়াত)

৮৬. সুপারিশের প্রতি এ বিধি-নিষেধ আরোপিত কেন, এর কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরেশতা, আম্বিয়া বা আউলিয়া যে-ই হোন না কেন কারো রেকর্ড সম্পর্কে এদের কারো কিছুই জানা নেই এবং জানার কোনো ক্ষমতাও এদের নেই। দুনিয়ায় কে কি করতো এবং আল্লাহর আদালতে কে কোন ধরনের ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং কেমন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে এসেছে তাও কেউ জানে না। অপরদিকে আল্লাহ প্রত্যেকের অতীতের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড জানেন। তার বর্তমান ভূমিকাও তিনি জানেন। সে সৎ হলে কেমন ধরনের সৎ। অপরাধী হলে কোন্ পর্যায়ের অপরাধী। তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য কি না। সে কি পূর্ণ শাস্তিলাভের অধিকারী অথবা কম শাস্তির। এহেন অবস্থায় কেমন করে ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে তাদের ইচ্ছামতো যার পক্ষে যে কোনো ধরনের সুপারিশ তারা চায় তা করার জন্য তাদেরকে অবাধ অনুমতি দেয়া যেতে পারে? একজন সাধারণ অফিসার তার নিজের ক্ষুদ্রতম বিভাগে যদি নিজের প্রত্যেকটি বন্ধু ও আত্মীয়ের সুপারিশ শুনতে শুরু করে দেন তাহলে মাত্র চারদিনেই সমগ্র বিভাগটিকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তার কাছ থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তাঁর দরবারে ব্যাপকভাবে সুপারিশ চলতে থাকবে এবং প্রত্যেক বুযর্গ সেখানে গিয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়ে আনবেন। অথচ তাদের কেউই যাদের সুপারিশ তারা করছেন তাদের কার্যকলাপ কেমন তা জানেন না। দুনিয়ায় যে কর্মকর্তা দায়িত্বের সামান্যতম অনুভূতিও রাখেন তার কর্মনীতি এ পর্যায়েরই হয়ে থাকে যে, যদি তার কোনো বন্ধু তার কোনো অধস্তন কর্মচারীর সুপারিশ নিয়ে আসে তাহলে সে তাকে বলে, আপনি জানেন না এ ব্যক্তি কত বড় ফাঁকিবাজ, দায়িত্বহীন, ঘুষখোর ও অত্যাচারী। আমি এর যাবতীয় কীর্তিকলাপের খবর রাখি। কাজেই আপনি মেহেরবানী করে অন্তত আমার কাছে তার সুপারিশ করবেন না। এ ছোট্ট উদাহরণটির ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ আয়াতে সুপারিশ সম্পর্কে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা কতদূর সঠিক, যুক্তি-সংগত ও ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার দরজা বন্ধ হবে না। আল্লাহর সৎ বান্দারা যারা দুনিয়ায় মানুষের সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাদেরকে আখেরাতেও সহানভূতির অধিকার

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾
وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

—লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে যুলুমের গোনাহের ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোনো জুলুম বা অধিকার হরণের আশংকা নেই।[৮৭]

আর হে মুহাম্মাদ! এভাবে আমি একে আরবী কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি[৮৮] এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে বাঁচবে বা এদের মধ্যে এর বদৌলতে কিছু সচেতনতার নিদর্শন ফুটে উঠবে।[৮৯]

কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উন্নত ও মহান।[৯০]

আর দেখো, কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার অহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে আরো জ্ঞান দাও।[৯১]

আমি[৯২] এর আগে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম[৯৩] কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প পাইনি।[৯৪]

আদায় করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু তারা সুপারিশ করার আগে অনুমতি চেয়ে নেবেন। যার পক্ষে আল্লাহ তাদেরকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র তার পক্ষেই তারা সুপারিশ করতে পারবেন। আবার সুপারিশ করার জন্যও শর্ত হবে যে, তা সংগত এবং ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে যেমন وَقَالَ صَوَابًا (এবং ঠিক কথা বলবে) আল্লাহর এ উক্তিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, সেখানে আজেবাজে সুপারিশ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। যেমন একজন দুনিয়ায় শত শত, হাজার হাজার লোকের অধিকার গ্রাস করে এসেছে

কিন্তু কোনো এক বুযর্গ হঠাৎ উঠে তার পক্ষে সুপারিশ করে দিলেন যে, হে আল্লাহ! তাকে পুরস্কৃত করুন, কারণ সে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন।

৮৭. কারণ সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলীর (Merits) ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। যে ব্যক্তি কোনো জুলুমের গোনাহের বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে, সে আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধে জুলুম করুক বা আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের বিরুদ্ধে অথবা নিজের নফসের বিরুদ্ধে জুলুম করুক না কেন যে কোনো অবস্থায়ই এগুলো তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে না। অন্যদিকে যারা ঈমান ও সৎকাজ (নিছক সৎকাজ নয় বরং ঈমান সহকারে সৎকাজ এবং নিছক ঈমানও নয় বরং সৎকাজ সহকারে ঈমান) নিয়ে আসবে তাদের ওপর সেখানে জুলুম হবার কোনো আশংকা নেই অর্থাৎ নিরর্থক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং সমস্ত অধিকার গ্রাস করে নেয়া হবে এমন কোনো আশংকাও সেখানে থাকবে না।

৮৮. অর্থাৎ তা এমনিতর বিষয়বস্তু, শিক্ষাবলী ও উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র ওপরের আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিকটবর্তী বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়নি। বরং কুরআনে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেসব দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আবার কুরআন সম্পর্কে সূরার সূচনায় এবং তারপর মূসার কাহিনীর শেষ পর্যায়ের আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে এর বর্ণনা পরম্পরা সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার প্রতি যে "স্মারক" পাঠানো হয়েছে এবং আমার কাছ থেকে বিশেষভাবে আমি যে "স্মরণ" তোমাকে দিয়েছি তা এ ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন স্মারক ও স্মরণ।

৮৯. অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি থেকে সজাগ হবে, ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে কিছুটা স্মরণ করবে এবং পথ ভুলে কোন্ পথে যাচ্ছে আর এই পথ ভুলে চলার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে এদের মনে বেশ কিছুটা অনুভূতি জাগবে।

৯০. কুরআনে সাধারণত একটি ভাষণ শেষ করতে গিয়ে এ ধরনের বাক্য বলা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর কালামের সমাপ্তি তাঁর প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে করাই হয় এর উদ্দেশ্য। বর্ণনাভংগী ও পূর্বাপর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে একটি ভাষণ শেষ হয়ে গেছে এবং وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। বেশীর ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, এ দুটি ভাষণ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়ে থাকবে এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী দুটিকে এক জায়গায় একত্র করে দিয়ে থাকবেন। একত্র করার কারণ উভয় ভাষণের বিষয়গত সাদৃশ্য। এ বিষয়টি আমি পরবর্তী আলাচনায় সুস্পষ্ট করে দেবো।

৯১. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ বাক্যেই ভাষণ খতম হয়ে গেছে। এরপর বিদায় নেবার সময় ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। অহী নাযিল করার সময় এটা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে সংশোধন করে দেয়া সংগত মনে করা হয়নি। তাই বাণী পাঠানোর কাজ শেষ হবার পর এখন তার এ সংশোধনী দিচ্ছেন। সতর্কবাণীর শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশ হচ্ছে যে, কি ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল। অহীর বাণী গ্রহণ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্মরণ রাখার এবং মুখে পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করে থাকবেন। এ প্রচেষ্টার কারণে তাঁর মনোযোগ বারবার সরে গিয়ে থাকবে। ফলে অহী গ্রহণের ধারাবাহিকতার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বাণী শোনার প্রতি মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। এ অবস্থা দেখে এ প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছে যে, তাঁকে অহীর বাণী গ্রহণ করার সঠিক পদ্ধতি বুঝাতে হবে এবং মাঝখানে মাঝখানে স্মরণ রাখার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেন তা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে হবে।

এ থেকে জানা যায়, সূরা "ত্বা-হা"র এ অংশটি প্রথম যুগের অহীর অন্তরভুক্ত। প্রথম যুগে তখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অহী গ্রহণ করার অভ্যাস ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় কয়েকবার তিনি এ কাজ করেছেন। প্রত্যেকবার এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দেবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো না কোনো বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে। সূরা "কিয়ামাহ" নাযিলের সময়ও এমনটিই হয়েছিল। তাই তখন বাণীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছিলঃ

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ○ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

"কুরআনকে দ্রুত স্মরণ করার জন্য তোমার জিহবা বার বার সঞ্চালন করো না। তা স্মরণ করিয়ে ও পড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমি তা শুনাচ্ছি তখন তুমি গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতে থাকো, তারপর তার অর্থ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার।"

সূরা আ'লায়েও তাঁকে এ নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, "আমি তা পড়িয়ে দেবো এবং তুমি তা ভুলে যাবে না।" سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى—পরে যখন তিনি অহীর বাণী গ্রহণ করার ব্যাপারে ভালোমতো পারদর্শিতা লাভ করেন তখন তিনি আর এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হননি। এ কারণে পরবর্তী সূরাগুলোয় এ ধরনের কোনো সতর্কবাণী আমরা দেখি না।

৯২. যেমন এর আগে বলা হয়েছে, এখান থেকে আর একটা আলাদা ভাষণ শুরু হয়েছে। সম্ভবত ওপরের ভাষণের পর কোনো এক সময় এটি নাযিল হয়েছিল এবং বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এর সাথে মিলিয়ে একই সূরার মধ্যে উভয়কে একত্র করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য একাধিক। যেমন ঃ

এক ঃ কুরআন যে ভুলে যাওয়া শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তা সেই একই শিক্ষা যা মানব জাতিকে তার সৃষ্টির সূচনায় দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ যা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন এবং যা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য কুরআনের পূর্বে বারবার "স্মারক" আসতে থেকেছে।

দুই ঃ শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ বারবার এ শিক্ষা ভুলে যায় এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই বরাবর সে এ দুর্বলতা দেখিয়ে আসছে। তাই মানুষ বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকার মুখাপেক্ষী।

তিন ঃ মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করে তার এমন আচরণের ওপর যা আল্লাহ প্রেরিত এই "স্মারকের" সাথে সে করবে। সৃষ্টির সূচনালগ্নে একথা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল। আজ এটা কোনো নতুন কথা বলা হচ্ছে না যে, এর অনুসরণ করলে গোমরাহী ও দুর্ভাগ্য থেকে সংরক্ষিত থাকবে অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে বিপদে পড়বে।

চার ঃ একটি জিনিস হচ্ছে, ভুল, সংকল্পের অভাব ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। এরি কারণে মানুষ তার চিরন্তন শত্রু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এবং ভুল করে বসে। মানুষের মনে ভুলের অনুভূতি জাগার সাথে সাথেই সে যদি নিজের দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং অবাধ্যতা পরিহার করে আনুগত্যের পথে ফিরে আসে তাহলেই সে ক্ষমা লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে, বিদ্রোহ ও সীমালংঘন এবং ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহর মোকাবিলায় শয়তানের দাসত্ব করা। ফেরাউন ও সামেরী এ কাজ করেছিল। এর ক্ষমার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফেরাউন ও সামেরী নিজেদের যে পরিণতি ভোগ করেছে এর পরিণতিও তাই হবে। যে ব্যক্তি এ কর্মনীতি অবলম্বন করবে সে-ই এ পরিণতির শিকার হবে।

৯৩. আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা এর আগে সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ (দু'জায়গায়), সূরা হিজর, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহাফে আলোচিত হয়েছে। এখানে সপ্তমবার এর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গায় বর্ণনা পরম্পরার সাথে এর সম্পর্ক ভিন্নতর এবং প্রত্যেক জায়গায় এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যে জায়গায় আলোচ্য বিষয়ের সাথে ঘটনার যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে সে জায়গায় সেটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য জায়গায় তা পাওয়া যাবে না অথবা বর্ণনাভংগী সামান্য আলাদা হবে। পুরো ঘটনাটা বা এর পূর্ণ তত্ত্ব অনুধাবন করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সব জায়গাগুলোই পড়ে নেয়া উচিত। আমি সব জায়গায়ই এর সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং এর ফলাফল টীকায় বর্ণনা করে দিয়েছি।

৯৪. অর্থাৎ তিনি পরবর্তী পর্যায়ে এ নির্দেশের সাথে যে আচরণ করেন তা অহংকার ও ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহের ভিত্তিতে ছিল না বরং গাফলতি ও ভুলের শিকার হবার এবং সংকল্প ও ইচ্ছার দুর্বলতার কারণে ছিল। তিনি এ ধরনের কোনো চিন্তা ও সংকল্পের ভিত্তিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি যে, আমি আল্লাহর পরোয়া করতে যাবো কেন, তাঁর হুকুম হয়েছে তাতে কি হয়েছে, আমার মন যা চাইবে আমি তা করবো, আল্লাহ আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন কেন ? এর পরিবর্তে বরং তাঁর আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণ এই ছিল যে, তিনি আল্লাহর হুকুম মনে রাখার চেষ্টা করেননি, তিনি তাঁকে কি বুঝিয়েছিলেন তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এবং তার ইচ্ছাশক্তি খুব বেশী মজবুত ছিল না যার ফলে যখন শয়তান তাঁকে প্ররোচিত করতে এলো তখন তিনি পূর্বাহ্নে প্রদত্ত আল্লাহর সতর্কবাণী ও উপদেশ (যার আলোচনা এখনই সামনে আসছে) স্মরণ করতে পারলেন না এবং শয়তান প্রদত্ত লোভ ও লালসার কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেন না।

"আমি তার মধ্যে সংকল্প পাইনি" এ বাক্যের অর্থ কেউ কেউ এরূপ নিয়েছেন যে, "আমি তার মধ্যে নাফরমানীর সংকল্প পাইনি" অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেছেন ভুল করে করেছেন, নাফরমানী করার সংকল্প নিয়ে করেননি। কিন্তু খামাখা এ ধরনের সংকোচ করার

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾

৭ রুকূ'

স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু একমাত্র ইবলীস অস্বীকার করে বসলো। এ ঘটনায় আমি আদমকে বললাম,[৯৫] দেখো, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু,[৯৬] এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়[৯৭] এবং তোমরা বিপদে পড়ে যাও। এখানে তো তুমি এ সুবিধে পাচ্ছো যে, তুমি না অভুক্ত ও উলংগ থাকছো এবং না পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লান্ত হচ্ছো।[৯৮] কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল,[৯৯] বলতে থাকলো, "হে আদম! তোমাকে কি এমন গাছের কথা বলে দেবো যা থেকে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় রাজ্য লাভ করা যায়?"[১০০]

কোনো প্রয়োজন নেই। একথা বলতে হলে لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عَلَى الْعِصْيَانِ বলা হতো, শুধুমাত্র لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا বলা হতো না। আয়াতের শব্দাবলী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সংকল্পের অভাব মানে হুকুম মেনে চলার সংকল্পের অভাব, নাফরমানী করার সংকল্পের অভাব নয়। তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি ও পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি নজর দিলে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, এখানে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের ভূমিকা ও মর্যাদা কালিমামুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ ঘটনা বর্ণনা করছেন না বরং তিনি একথা বলতে চান যে, তিনি যে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং যে কারণে শুধু তিনি একাই নন বরং তাঁর সন্তানরাও আল্লাহর আগাম সতর্কবাণী সত্ত্বেও নিজের শত্রুর ফাঁদে পা দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দিয়েই চলেছে সেটি কি ছিল। উপরন্তু যে ব্যক্তিই খোলা মনে এ আয়াতটি পড়বে তার মনে প্রথমে এ অর্থটিই ভেসে উঠবে যে, "আমি তার মধ্যে হুকুমের আনুগত্য করার সংকল্প বা মজবুত ইচ্ছাশক্তি পাইনি। দ্বিতীয় অর্থটি তার মনে ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না সে আদম আলাইহিস সালামের সাথে গোনাহের সম্পর্ক স্থাপন করা অসংগত মনে করে আয়াতের অন্য কোনো অর্থ খোঁজা শুরু করে দেবে। এ অবস্থায় এ অভিমত আল্লামা আলুসীও তাঁর তাফসীরে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لكن لا يخفى عليك ان هذا التفسير غير متبادر ولا كثير المناسبة للمقام -

"একথা তোমার কাছে গোপন থাকা উচিত নয় যে, আয়াতের শব্দাবলী শুনে এ ব্যাখ্যার সংগে সংগেই মনে উদয় হয় না এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথেও এটা তেমন কোনো সম্পর্ক রাখে না।" (দেখুন রুহুল মা'আনী, ১৬ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

৯৫. আদম আলাইহিস সালামকে যে আসল হুকুমটি দেয়া হয়েছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সে হুকুমটি হচ্ছে এই যে, "এ বিশেষ গাছটির ফল খেয়ো না।" কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ হুকুমটি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যেহেতু বলার আসল বিষয়টি হচ্ছে শুধুমাত্র এতটুকু যে, মানুষ কিভাবে আল্লাহর আগাম সতর্কবাণী ও উপদেশ দান সত্ত্বেও নিজের পরিচিত শত্রুর কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয় এবং তার এ দুর্বলতা কিভাবে তার থেকে এমন কাজ করিয়ে নেয় যা তার নিজের স্বার্থ বিরোধী হয়, তাই আল্লাহ আসল হুকুম উল্লেখ করার পরিবর্তে এখানে কেবল মাত্র তার সাথে হযরত আদমকে (আ) যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল সেটির উল্লেখ করেছেন।

৯৬. শত্রুতার প্রদর্শনী তখনই হয়ে গিয়েছিল। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিলেন ইবলীস তাঁদেরকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছিল ঃ

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

"আমি তার চাইতে ভালো, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" (আ'রাফ ঃ ১২ এবং সাদ ঃ ৭৬)

اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ "একটু দেখো তো, এ সত্তাটিকে তুমি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো।" ءَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا "এখন কি আমি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি থেকে ?" (বনী ইসরাঈল ঃ ৬১-৬২) তারপর শুধুমাত্র প্রকাশ্যে নিজের ঈর্ষা প্রকাশ করেই সে ক্ষান্ত থাকেনি বরং আল্লাহর কাছে এই বলে নিজের জন্য অবকাশও চেয়ে নিয়েছিল যে, আমাকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার অযোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ দিন, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দেখিয়ে দেবো সে আপনার কেমন ধরনের প্রতিনিধি। সূরা আ'রাফ, হিজর ও বনী ইসরাঈলে তার এই চ্যালেঞ্জ উচ্চারিত হয়েছে এবং সামনের দিকে সূরা সাদেও আসছে। তাই আল্লাহ যখন বললেন, এ তোমাদের শত্রু তখন এটা নিছক একটা অজানা সংবাদ ছিল না বরং এমন একটা জিনিস ছিল যা ঠিক সময় মতো স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছেন এবং স্বকর্ণে শুনেছেনও।

৯৭. এভাবে উভয়কে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, যদি তার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে তোমরা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করো তাহলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না এবং তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেসব তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে।

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾

শেষ পর্যন্ত দুজন (স্বামী-স্ত্রী) সে গাছের ফল খেয়ে বসলো। ফলে তখনই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং দুজনাই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেকে ঢাকতে লাগলো।[১০১] আদম নিজের রবের নাফরমানী করলো এবং সে সঠিক পথ থেকে সরে গেল।[১০২] তারপর তার রব তাকে নির্বাচিত করলেন,[১০৩] তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশনা দান করলেন।[১০৪]

৯৮. জান্নাত থেকে বের হবার পর মানুষকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তার বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে। এ সময় জান্নাতের বড় বড় পূর্ণাংগ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলো উল্লেখ করার পরিবর্তে তার চারটি মৌলিক নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তোমাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও গৃহের ব্যবস্থা সরকারীভাবে করা হচ্ছে। এর কোনো একটি অর্জন করার জন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে না। এ থেকে আপনাআপনি একথা আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে জান্নাত থেকে বের হয়ে তারা এখানকার বড় বড় নিয়ামত তো দূরের কথা মৌলিক জীবন উপকরণও লাভ করবে না। নিজেদের প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্যও তারা প্রচেষ্টা চালাতে এবং জীবনপাত করতে বাধ্য হবে। মাথার ঘাম পায়ে না ফেলা পর্যন্ত একবেলার আহারেরও সংস্থান করতে পারবে না। দু'বেলা দু'মুঠো আহারের চিন্তা তাদের মনোযোগ, সময় ও শক্তির এমন বৃহত্তম অংশ টেনে বের করে নিয়ে যাবে যে, কোনো উন্নততর উদ্দেশ্যের জন্য কিছু করার অবকাশ ও শক্তি তাদের থাকবে না।

৯৯. এখানে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, আদম ও হাওয়ার মধ্যে আসলে যাকে শয়তান প্ররোচিত করেছিল তিনি হাওয়া ছিলেন না বরং ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। যদিও সূরা আ'রাফের বক্তব্যে দু'জনকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সেখানে দু'জনকেই প্ররোচিত বলা হয়েছে কিন্তু শয়তানের প্ররোচনার গতিমুখ ছিল মূলত হযরত আদমেরই দিকে। অন্যদিকে বাইবেলের বর্ণনা মতে সাপ প্রথমে মহিলা অর্থাৎ হযরত হাওয়ার সাথে কথা বলে এবং হাওয়া তার স্বামীকে প্ররোচিত করে তাঁকে গাছের ফল খাওয়ান। (আদি পুস্তক ঃ ৩)

১০০. সূরা আ'রাফে আমরা শয়তানের কথাবার্তার আরো যে বিস্তারিত বিবরণ পাই তা হচ্ছে এই যে,

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ـ

"আর সে বললো, তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছটি থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত রেখেছেন, যাতে তোমরা দু'জন ফেরেশতা অথবা চিরঞ্জীব না হয়ে যাও।"(২০ আয়াত)

১০১. অন্য কথায় নাফরমানীর প্রকাশ ঘটার সাথে সাথেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে যেসব জীবনোপকরণ দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। আর এর প্রথম প্রকাশ ঘটলো পোশাক ছিনিয়ে নেবার মধ্য দিয়েই। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়া তো ছিল পরবর্তীকালের ব্যাপার। ক্ষুধা ও পিপাসা লাগলে তবেই না খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা বুঝা যেতো এবং বাসস্থান থেকে বের করে দেবার ব্যাপারটিও ছিল পরবর্তীকালীন ব্যাপার। কিন্তু নাফরমানীর প্রথম প্রভাব পড়লো সরকারী পোশাকের ওপর। কারণ তা সংগে সংগেই খুলে নেয়া হয়েছিল।

১০২. এখানে আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল তার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা উচিত। তিনি আল্লাহকে নিজের স্রষ্টা ও রব বলে জানতেন এবং অন্তর দিয়ে তা মানতেন। জান্নাতে তিনি যেসব জীবনোপকরণ লাভ করেছিলেন সেগুলো সবসময় তাঁর সামনে ছিল। শয়তানের হিংসা ও শত্রুতার জ্ঞানও তিনি সরাসরি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে হুকুম দেবার সাথে সাথেই বলে দিয়েছিলেন, এ হচ্ছে তোমার শত্রু, তোমাকে নাফরমানী করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবে ফলে এজন্য তোমাকে এ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। শয়তান তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তার শিকড় উপড়ে ফেলবো। এসব সত্ত্বেও শয়তান যখন তার সামনে স্নেহশীল উপদেশ দাতা ও কল্যাণকামী বন্ধুর বেশে এসে তাঁকে একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার (চিরন্তন জীবন ও অন্তহীন শাসন কর্তৃত্ব) লোভ দেখালো তখন তার লোভ দেখানোর মোকাবিলায় তিনি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর পা পিছলে গেলো। অথচ এখনো আল্লাহর প্রতি তাঁর বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য দেখা দেয়নি। এবং তাঁর ফরমান আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ ধরনের কোনো ভাবনাও তাঁর মনে জাগেনি। শয়তানী লালসাবৃত্তির আওতাধীনে যে একটি তাৎক্ষণিক আবেগ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁকে ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করলো এবং আত্মসংযমের বাঁধন ঢিলে হবার সাথে সাথেই তিনি আনুগত্যের উন্নত স্থান থেকে গোনাহের নিম্নপংকে নেমে গেলেন। এ "ভুল" ও সংকল্প বিহীনতার উল্লেখ কাহিনীর শুরুতেই করা হয়েছিল। এ আয়াতের শুরুতে এরি ফলশ্রুতি হিসেবে নাফরমানী ও ভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টির সূচনাতেই মানুষের এ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে এমন কোনো যুগ আসেনি যখন তার মধ্যে এ দুর্বলতা পাওয়া যায়নি।

১০৩. অর্থাৎ শয়তানের মতো আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত করেননি। আনুগত্যের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যেখানে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁকে পড়ে থাকতে দেননি বরং উঠিয়ে আবার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন এবং নিজের খেদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রোহকারী এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশকারী ভৃত্যের সাথে এক ধরনের আচরণ করা হয়। শয়তান ছিল এর হকদার এবং এমন প্রত্যেক বান্দাও এর হকদার হয়ে পড়ে যে নিজের রবের নাফরমানী করে এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে সামনে দাঁড়ায়। আর এক ধরনের আচরণ করা হয় এমন বিশ্বস্ত বান্দার সাথে যে নিছক "ভুল" ও

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

আর বললেন, "তোমরা (উভয় পক্ষ অর্থাৎ মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু থাকবে। এখন যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো নির্দেশনামা পৌঁছে যায় তাহলে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ মেনে চলবে সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্য পীড়িতও হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার 'যিকির' (উপদেশমালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন[১০৫] এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।"[১০৬]

"সংকল্পহীনতা"র কারণে অপরাধ করে বসে এবং তারপর সজাগ হবার সাথে সাথেই নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়। হযরত আদম ও হাওয়ার সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল। কারণ নিজেদের ভুলের অনুভূতি হবার সাথে সাথেই তারা বলে উঠেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং যদি তুমি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের প্রতি করুণা না করো তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" (আ'রাফ ঃ ২৩)

১০৪. অর্থাৎ শুধু মাফই করেননি বরং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথও বাতলে দিয়েছেন এবং তার ওপর চলার পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

১০৫. দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন হবার মানে এই নয় যে, দুনিয়ায় তাকে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারবে না। কোটিপতি হলেও মানসিক অস্থিরতায় ভুগবে। সাত মহাদেশের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট হলেও মানসিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না। তার পার্থিব সাফল্যগুলো হবে হাজারো ধরনের অবৈধ কলাকৌশল অবলম্বনের ফল। এগুলোর কারণে নিজের বিবেকসহ চারপাশের সমগ্র সামজিক পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে তার লাগাতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। যার ফলে সে কখনো মানসিক প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারবে না।

১০৬. এখানে আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী শেষ হয়ে যায়। এ কাহিনী যেভাবে এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আমি একথা বুঝেছি যে, (অবশ্য আল্লাহ সঠিক জানেন) আদম আলাইহিস সালামকে

শুরুতে জান্নাতে যা দেয়া হয়েছিল সেটিই ছিল যমীনের আসল খিলাফত। সে জান্নাত সম্ভবত আকাশে বা এ পৃথিবীতেই বানানো হয়েছিল। মোটকথা সেখানে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধিকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বে ছিল এবং সেবকরা (ফেরেশতাগণ) তার হুকুমের অনুগত ছিলেন।

খিলাফতের বৃহত্তর ও উন্নততর দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি যাতে সচেষ্ট হতে পারেন এজন্য তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের আদৌ কোনো চিন্তা তাকে করতে হতো না। কিন্তু প্রার্থীর যোগ্যতার অবস্থা সুস্পষ্ট হবার এবং তার দুর্বলতা ও সবলতাগুলো প্রকাশিত হবার জন্য এ পদে স্থায়ী নিযুক্তির পূর্বে তার পরীক্ষা নেয়া অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। সে জন্যই এই পরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে যে কথা সুস্পষ্ট হয়েছে তা এই ছিল যে, লোভ ও লালসা প্রদর্শনে প্রভাবিত হয়ে এ প্রার্থীর পা পিছলে যায়। আনুগত্যের সংকল্পের ওপর সে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। বিস্মৃতি তার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই পরীক্ষার পর আদম ও তার সন্তানদেরকে স্থায়ী খিলাফতে নিযুক্তির পরিবর্তে পরীক্ষামূলক খিলাফত দান করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষার জন্য একটি সময়সীমা (নির্ধারিত সময়সীমা, কিয়ামত পর্যন্ত যার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে) নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের জন্য জীবন ধারণের সরকারী ব্যবস্থাপনা খতম করে দেয়া হয়েছে। এখন নিজেদের জীবনোপকরণ তাদের নিজেদেরই সংগ্রহ করে নিতে হবে। তবে পৃথিবী ও তার সৃষ্টিসমূহের ওপর তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছে। এখন এরি পরীক্ষা চলছে যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা আনুগত্য করে কিনা এবং ভুল হয়ে গেলে অথবা লোভ ও লালসার প্রভাবে পা পিছলে গেলে সতর্কবাণী, স্মারক ও শিক্ষার প্রভাব গ্রহণ করে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে কি না ? এবং তাদের শেষ ফায়সালা কি হয়, আনুগত্য না নাফরমানী ? এ পরীক্ষামূলক খিলাফতের যুদ্ধে প্রত্যেকের কর্মধারার রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে এবং যে চিরন্তন জীবন ও অবিনশ্বর রাজত্বের লোভ দেখিয়ে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করেছিল শেষ বিচার ও হিসেবের দিন যারা সফলকাম হবে তাদেরকে আবার সেই স্থায়ী খিলাফত দান করা হবে। সে সময় এ সমগ্র পৃথিবীটিকে জান্নাতে পরিণত করা হবে। আল্লাহর এমন সব সৎ বান্দা এর উত্তরাধিকারী হবে যারা পরীক্ষামূলক খিলাফতের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অথবা ভুল করার পর শেষ পর্যন্ত আবার আনুগত্যের দিকে ফিরে এসে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেবে। জান্নাতের এই জীবনকে যারা নিছক, পানাহার করা ও আয়েশ আরাম করে বুক ফুলিয়ে চলার জীবন মনে করে তাদের ধারণা সঠিক নয়। সেখানে অনবরত উন্নতি হতে থাকবে, অবনতির কোনো ভয় থাকবে না। মানুষ সেখানে আল্লাহর খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করবে এবং এপথে আবার কোনো প্রকার ব্যর্থতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না। কিন্তু সেই উন্নতি ও সেসব কার্যক্রমের কল্পনা করা আমাদের জন্য ঠিক ততটাই কঠিন যেমন একটি শিশুর জন্য সে বড় হয়ে যখন বিয়ে করবে তখন দাম্পত্য জীবনের অবস্থা কেমন হবে একথা কল্পনা করা কঠিন হয়। এজন্যই কুরআনে জান্নাতের জীবনের শুধুমাত্র এমনসব তৃপ্তি ও স্বাদ-আহলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে দুনিয়ার ভোগ ও স্বাদ-আহলাদের সাথে তুলনা করে সেগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুটা আন্দাজ অনুমান করতে পারি।

এ সুযোগে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বাইবেলে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া কম আকর্ষণীয় হবে না। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে "খোদা পৃথিবীর মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেন। তার নাসিকায় ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করান। এভাবে মানুষ জীবন লাভ করে। আর খোদা পূর্বদিকে এদনে একটি উদ্যান নির্মাণ করান এবং সেখানে নিজের তৈরি করা মানুষকে রাখেন" "আর উদ্যানের মাঝখানে জীবন বৃক্ষ ও ভালো ও মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষও উৎপন্ন করেন।" "আর খোদা আদমকে হুকুম দেন এবং বলেন, তুমি উদ্যানের প্রতিটি গাছের ফল নির্দ্বিধায় খেতে পারো কিন্তু ভালো মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল কখনো খেয়ো না। কারণ যেদিন তুমি ওর মধ্য থেকে খাবে সেদিনই মারা পড়বে।" "আর খোদা আদমের মধ্য থেকে যে পঞ্জর বের করেছিলেন তা থেকে এক নারী সৃষ্টি করে তাকে আদমের কাছে আনেন।" "আর আদম ও তার স্ত্রী উভয়ই উলংগ ছিলেন, তাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" "আর ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে বেশী খল। সে ঐ নারীকে বললো, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোনো বৃক্ষের ফল খেয়ো না ?" "সাপ নারীকে বললো, তোমরা কোনোক্রমেই মরবে না, বরং ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে ভালো মন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে।" "এ জন্য নারী তার ফল পেড়ে খেয়ে ফেললেন এবং নিজের স্বামীকেও খাওয়ালেন।" "তখন তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, তারা উলংগ। আর তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে নিজেদের জন্য ঘাঘরা প্রস্তুত করলেন। আর তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করছিলেন। তাহাতে আদম ও তাঁর স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে উদ্যানের বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকালেন।" "তখন খোদা আদমকে ডেকে বললেন, তুমি কোথায় ? তিনি বললেন, আমি উদ্যানে তোমার আওয়াজ শুনে ভীত হয়েছি এবং লুকিয়েছি, কারণ আমি উলংগ। খোদা বললেন, তুমি যে উলংগ তা তোমাকে কে বললো ? যে বৃক্ষের ফল খেতে তোমাকে বারণ করেছিলাম নিশ্চয়ই তুমি তার ফল খেয়েছো। আদম বললেন, হাওয়া আমাকে তার ফল খাইয়েছে। আর হাওয়া বললো, আমাকে সাপ প্ররোচিত করেছিল। একথায় আল্লাহ সাপকে বললেন, "তুমি এই কাজ করেছো, তাই গ্রাম্য বন্য পশুদের মধ্যে তুমি অধিক শাপগ্রস্ত ; তুমি বুকে হাঁটবে এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করবো; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পাদমূল চূর্ণ করবে।" এবং নারীকে এ শাস্তি দিলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেবো তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে ; ও সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" আর আদমের ব্যাপারে এ ফায়সালা করলেন যে, যেহেতু তুমি নিজের স্ত্রীর কথা মেনে নিয়েছো এবং আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেছো, "তাই তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হলো, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে তা ভোগ করবে .... তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে।" তারপর "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক তৈরি করে তাদেরকে তা পরালেন।" "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, দেখো, মানুষ ভালোমন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের একের মতো হলো ; এখন এমন যেমন না হয় যে, সে হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষের ফলও পেড়ে খায় এবং অনন্তজীবী হয়। তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে এদনের উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।" (আদি পুস্তক ২ ঃ ৭-২৫, ৩ ঃ ১-২৩)

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۞ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ۞

—সে বলবে, "হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন?" আল্লাহ বলবেন, "হ্যাঁ, এভাবেই তো। আমার আয়াত যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"[১০৭]—এভাবেই আমি সীমালংঘনকারী এবং নিজের রবের আয়াত অমান্যকারীকে (দুনিয়ায়) প্রতিফল দিয়ে থাকি[১০৮] এবং আখেরাতের আযাব বেশী কঠিন এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী।

তাহলে কি এদের[১০৯] (ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে) কোনো পথনির্দেশ মেলেনি যে, এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতিগুলোতে আজ এরা চলাফেরা করে? আসলে যারা ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে বহু নিদর্শন।[১১০]

যারা একথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না যে, কুরআনে এ কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে নকল করা হয়েছে তাদের কাছে বাইবেলের এ বর্ণনা ও কুরআনের বর্ণনাকে একটু পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করার আবেদন জানাই।

১০৭. কিয়ামতের দিন নতুন জীবনের শুরু থেকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপরাধীদেরকে যেসব বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি অবস্থা হচ্ছে,

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○

"তুমি এ জিনিস থেকে গাফলতির মধ্যে পড়েছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পরদা সরিয়ে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ।" (কাফ ঃ ২২)

অর্থাৎ আজ তুমি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছো। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ○ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا تَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ -

"আল্লাহ তো তাদের আযাবকে সেদিনের জন্য পিছিয়ে দিচ্ছেন যেদিন অবস্থা এমন হবে যে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়েই থেকে যাবে, লোকেরা মাথা তুলে ছুটতেই থাকবে। চোখ উপরে তুলে তাকিয়েই থাকবে এবং মন দিশেহারা হয়ে যাবে।"

(ইবরাহীম ৪২-৪৩)

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○

"আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি লিখন বের করবো, যাকে সে পাবে উন্মুক্ত কিতাব হিসেবে। পড়ো নিজের আমলনামা আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (বনী ইসরাঈল ঃ ১৩-১৪)

আর আমাদের আলোচ্য আয়াতে এসব অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আল্লাহর অসীম ক্ষমতাবলে তারা আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং নিজেদের দুষ্কৃতির ফল তো খুব ভালোভাবেই দেখবে কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র এগুলোই দেখার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। বাদবাকি অন্যান্য দিক থেকে তাদের অবস্থা হবে এমন অন্ধের মতো যে, নিজের চলার পথ দেখতে পায় না। যার হাতে লাঠিও নেই, হাতড়ে চলার ক্ষমতাও নেই, প্রতি পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে, বুঝতে পারছে না সে কোন্ দিকে যাবে এবং নিজের প্রয়োজন কিভাবে পূর্ণ করবে। নিম্নলিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে এ অবস্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে ঃ "যেভাবে তুমি আমার আয়াতগুলো ভুলে গিয়েছিলে ঠিক তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" অর্থাৎ তুমি কোথায় কোথায় হোঁচট খাচ্ছো, আঘাত পাচ্ছো এবং কেমনতর বঞ্চনার শিকার হচ্ছো আজ তার কোনো পরোয়াই করা হবে না। কেউ তোমার হাত ধরবে না। তোমার অভাব ও প্রয়োজন কেউ পূর্ণ করবে না এবং তোমার কোনো রকম দেখাশুনা করা হবে না। তুমি চরম উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হবে।

১০৮. এখানে আল্লাহ "যিকির" অর্থাৎ তাঁর কিতাব ও তাঁর প্রেরিত উপদেশমালা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দুনিয়ায় যে "অতৃপ্ত জীবন" যাপন করানো হয় সেদিকে ইশারা করা হয়েছে।

১০৯. সে সময় মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখা হয়েছিল এবং এখানে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

১১০. অর্থাৎ ইতিহাসের এ শিক্ষায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এ পর্যবেক্ষণে, মানব জাতির এ অভিজ্ঞতায়।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ۝

৮ রুকূ'

যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেই একটি সিদ্ধান্ত না করে দেয়া হতো এবং অবকাশের একটি সময়সীমা নির্ধারিত না করা হতো, তাহলে অবশ্যি এরও ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হতো। কাজেই হে মুহাম্মাদ! এরা যেসব কথা বলে তাতে সবর করো এবং নিজের রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্য উদয়ের আগে ও তার অস্ত যাবার আগে, আর রাত্রিকালেও প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তগুলোতেও।[১১১] *হয়তো এতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।*[১১২] *আর চোখ তুলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের শান-শওকতের দিকে, যা আমি এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। এসব তো আমি এদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্য দিয়েছি এবং তোমার রবের দেয়া হালাল রিযিকই*[১১৩] *উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।*

১১১. অর্থাৎ যেহেতু মহান আল্লাহ এখনই তাদেরকে ধ্বংস করতে চান না এবং তাদের জন্য একটি অবকাশ সময় নির্ধারিত করে ফেলেছেন, তাই তাঁর প্রদত্ত এ অবকাশ সময়ে তারা তোমার সাথে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন তোমাকে অবশ্য তা বরদাশত করতে হবে এবং সবরের সাথে তাদের যাবতীয় তিক্ত ও কড়া কথা শুনেও নিজের সত্যবাণী প্রচার ও স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তুমি নামায থেকে এ সবর, সহিষ্ণুতা ও সংযমের শক্তি লাভ করবে। এ নির্ধারিত সময়গুলোতে তোমার প্রতিদিন নিয়মিত এ নামায পড়া উচিত।

"রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা" করা মানে হচ্ছে নামায। যেমন সামনের দিকে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا "নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং নিজেও নিয়মিত তা পালন করতে থাকো।"

নামাযের সময়গুলোর প্রতি এখানেও পরিষ্কার ইশারা করা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের নামায। সূর্য অস্তে যাবার আগে আসরের নামায। আর রাতের বেলা এশা ও তাহাজ্জুদের নামায। দিনের প্রান্তগুলো অবশ্যি তিনটিই হতে পারে। একটি প্রান্ত হচ্ছে প্রভাত, দ্বিতীয় প্রান্তটি সূর্য ঢলে পড়ার পর এবং তৃতীয় প্রান্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা। কাজেই দিনের প্রান্তগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের নামায হতে পারে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ ১১৩, বনী ইসরাঈল ৯১ থেকে ৯৭, আর রূম ২৪ ও আল মু'মিন ৭৪ টীকাগুলো দেখুন।

১১২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্যও। একটি অর্থ হচ্ছে, তুমি নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকো। এই অবস্থায় নিজের কর্তব্য পালনের কারণে তোমাকে নানা অপ্রীতিকর কথা শুনতে হচ্ছে। তোমার প্রতি যারা অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম করছে তাদেরকে এখনো শাস্তি দেয়া হবে না, তারা সত্যের আহ্বায়ককে কষ্ট দিতেও থাকবে এবং পৃথবীর বুকে বুক ফুলিয়েও চলবে, আল্লাহর এই ফায়সালায় তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তুমি একবার একাজটি করে দেখো। এর এমন ফলাফল সামনে এসে যাবে যাতে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এ দ্বিতীয় অর্থটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে নামাযের হুকুম দেবার পর বলা হয়েছে ঃ

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

"আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থান) পৌছিয়ে দেবেন।" (৭৯ আয়াত)

অন্যত্র সূরা 'দু-হা'য় বলা হয়েছে ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"তোমার জন্য পরবর্তী যুগ অবশ্য পূর্ববর্তী যুগের চাইতে ভালো আর শিগ্‌গির তোমার রব তোমাকে এত কিছু দেবেন যার ফলে তুমি খুশী হয়ে যবে।"

১১৩. "রিয্‌ক" শব্দের অনুবাদ আমি করেছি "হালাল রিযিক"। এর কারণ মহান আল্লাহ কোথাও হারাম সম্পদকে "রবের রিযিক" হিসেবে পেশ করেননি। এর অর্থ হচ্ছে, এ ফাসেক ও দুশ্চরিত্র লোকেরা অবৈধ পথে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চমক সৃষ্টি করে নেয় তোমার ও তোমার মু'মিন সাথীদের তাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এ ধন-দওলত ও শান শওকত তোমাদের জন্য মোটেও ঈর্ষণীয় নয়। তোমরা নিজেরা পরিশ্রম করে যে পাক-পবিত্র রিযিক উপার্জন করো তা যতই সামান্য হোক না কেন সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদার লোকদের জন্য তাই ভালো এবং তার মধ্যে এমন কল্যাণ রয়েছে যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত বজায় থাকবে।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ
نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّآ
أَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا
فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ
فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ
اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার হুকুম দাও[১১৪] এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই।[১১৫]

তারা বলে, এ ব্যক্তি নিজের রবের পক্ষ থেকে কোনো নিশানী (মু'জিযা) আনে না কেন ? আর এদের কাছে কি আগের সহীফাগুলোর সমস্ত শিক্ষার সুস্পষ্ট বর্ণনা এসে যায়নি ?[১১৬] যদি আমি তার আসার আগে এদেরকে কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে আবার এরাই বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাওনি কেন, যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আয়াত মেনে চলতাম ? হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, সবাই কাজের পরিণামের প্রতীক্ষায় রয়েছে।[১১৭] কাজেই এখন প্রতিক্ষারত থাকো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কারা সোজা-সঠিক পথ অবলম্বনকারী এবং কারা সৎপথ পেয়ে গেছে।

১১৪. অর্থাৎ তোমাদের সন্তানরা যেন নিজেদের অভাব অনটন ও দূরবস্থার মোকাবিলায় এ হারামখোরদের ভোগ বিলাসিতা দেখে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। এ জিনিসটি তাদের দৃষ্টিভংগীতে পরিবর্তন ঘটাবে। তাদের মূল্যবোধ বদলে দেবে। তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করে দেবে। তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রিযিকের ওপর সবর করবে এবং তাতে পরিতুষ্ট হবে। ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয় তাকে তারা এমন ভোগের ওপর অগ্রাধিকার দিতে থাকবে, যা ফাসেকী, দুশ্চরিত্রতা ও পার্থিব লোভ লালসা থেকে অর্জিত হয়।

১১৫. আমার কোনো লাভের জন্য আমি তোমাদের নামায পড়তে বলছি না। বরং এতে লাভ তোমাদের নিজেদেরই। সেটি হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আর এটিই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে স্থায়ী ও শেষ সাফল্যের মাধ্যম।

১১৬. অর্থাৎ এটা কি কোনো ছোটখাটো মু'জিযা যে, তাদের মধ্য থেকে এক নিরক্ষর ব্যক্তি এমন একটি কিতাব পেশ করেছেন, যাতে শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাবলীর নির্যাস বের করে রেখে দেয়া হয়েছে ? মানুষের পথ নির্দেশনার জন্য ঐ সমস্ত কিতাবের মধ্যে যা কিছু ছিল তা কেবলমাত্র তার মধ্যে একত্রই করা হয়নি বরং তা এমন উন্মুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, একজন মরুচারী বেদুইনও তা অনুধাবন করে লাভবান হতে পারে।

১১৭. অর্থাৎ যখন থেকে এ দাওয়াতটি তোমাদের শহরে পেশ করা হয়েছে তখন থেকে শুধুমাত্র এ শহরের নয় বরং আশপাশের এলাকারও প্রতিটি লোক এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

❒